দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ১০ নভেম্বর - ২০১৪।। ২৩ কার্তিক - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

স্বচ্ছ ভারত

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

যোগগুরু বাবা রামদেব

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২৩ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১০ নভেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : আরাবুল বহিষ্কৃত ছ'বছর
৬ বছর পর দলটা থাকবে তো? □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

আত্মপ্রচারের স্বার্থে টিভি নয়, দেশের মানুষকে পাশে পেতেই বেতার ভাষণ মোদীর □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

কেশরী পত্রিকা, দেশপ্রেমী সাভারকর ও কংগ্রেসের ঘৃণ্য খেলা □ দেবব্রত ঘোষ □ ১১

নরেন্দ্র মোদীর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' □ অর্ণব নাগ □ ১৫

পরশুরাম : অবতারশক্তির দম্ভনাশ □
ড: ইন্দ্রজিৎ সরকার □ ২১

হিন্দুশাস্ত্রে পরিবেশ বিজ্ঞান □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২৩

ইয়াজদী : মধ্যপ্রাচ্যে হিন্দুদের হারিয়ে যাওয়া এক জাতি □
মুজফ্ফর হোসেন □ ২৭

প্রধানমন্ত্রীর 'শ্রমেব জয়তে' অভিযান কি শ্রম-আইন সংস্কারের ইঙ্গিত? □ এন সি দে □ ২৯

সংস্কৃতং বিনা ভারতীয়াং অসংস্কৃতা এব □
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রকাশিত হবে ১৭ নভেম্বর ২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৭ নভেম্বর ২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

একবিংশ শতাব্দীর রক্তচক্ষু : মাদ্রাসা

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। বিশ শতকের শেষে যখন মাদ্রাসা-র বিপদ-সংকেত অনুভূত হচ্ছিল, তখন এক শ্রেণীর মানুষ বললেন, এ নাকি সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার। এদের উস্কানিতে যখন মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠল তখন তারা আবার আইনি-বেআইনি মাদ্রাসার হিসেব করতে বসলেন। কিন্তু সাম্প্রতিকতম বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা মানেই সন্ত্রাসবাদের রক্তচক্ষু। একে উপেক্ষা করার সাহস যারা দেখাচ্ছেন, তারা মূর্খের স্বর্গে তো বাস করছেনই এবং এর পেছনে তাদের কায়েমি স্বার্থও রয়েছে। এ নিয়েই লিখেছেন— **জিতেন মিস্ত্রী ও একলব্য রায়।**

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

কালো টাকা

কালো টাকা লইয়া মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তোপ দাগাইয়া চলিতেছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁহার নির্বাচনী প্রচারে ক্ষমতায় আসিবার একশত দিনের মধ্যেই কালো টাকা দেশে ফিরাইয়া আনিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি এক বেতার বার্তার মাধ্যমে তিনি পুনরায় দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে টাকার অঙ্ক যাহাই হউক না কেন, তাহা তিনি ফিরাইয়া আনিবেন। দেশবাসী যেন তাঁহাদের 'প্রধানসেবক'-এর উপরে ভরসা রাখেন। শ্রীমোদী জানাইয়াছেন, কীভাবে টাকা ফিরিয়া আসিবে তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার নিকট যে তথ্য রহিয়াছে, ইহার ভিত্তিতে তিনি বলিতে পারেন, সঠিক পথেই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। বস্তুত, কীভাবে ওই টাকা ফিরাইয়া আনা যাইবে তাহা লইয়া যেমন একাধিক মত রহিয়াছে, তেমনই বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ লইয়াও রহিয়াছে একাধিক পরিসংখ্যান।

সাম্প্রতিক অতীতে এই দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী রেডিওর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত নাই। শুধু মনমোহন সিং নয়, অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলেও এই উদ্যোগ দেখা যায় নাই। প্রধানমন্ত্রী মোদী ইচ্ছা করিলে টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচার করিতে পারিতেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচার জোরদার হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। আজও ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছায় নাই। সেখানে মানুষ রেডিওতে খবর শুনিয়া থাকে। তিনি দেশের অবহেলিত দরিদ্র মানুষকে পাশে পাইতে চান বলিয়াই রেডিওর মাধ্যমে নিজের 'মনের কথা' (মন কি বাত) জানাইয়াছেন।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে বিদেশের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রহিয়াছে এমন ৬২৭ জনের নাম জমা দিয়াছে। সেই নাম প্রকাশ না করিয়া কালো টাকার তদন্তের দায়িত্বে থাকা বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর হাতে তুলিয়া দিয়াছে সর্বোচ্চ আদালত। নাম প্রকাশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তির যে জটিলতা রহিয়াছে কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তাহা জানাইয়াছেন। বিদেশের ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে সমস্ত দেশ চুক্তিবদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের জানানো তথ্য গোপন রাখিবার শর্ত পালন করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ হইলে তবেই নাম প্রকাশ করা যায়। আর তাই কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ করিবার বা না করিবার প্রশ্ন নয়, কখন নাম প্রকাশ করা হইবে, ইহাই বিতর্কের বিষয়। চুক্তিভঙ্গ করিয়া চার্জশিট পেশের আগেই যদি নাম প্রকাশ করা হয়, তবে বিদেশের ব্যাঙ্ক এই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোনো তথ্য বা প্রমাণ দিবে না। আর সেই ক্ষেত্রে কালো টাকার মালিকেরই সুবিধা। কেননা তথ্য বা প্রমাণের অভাবে তিনি বলিতেই পারেন, তাঁহাকে ফাঁসানো হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি আগে হইতে সতর্ক হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ লোপাটও করিয়া দিতে পারেন। তাই চুক্তি ভাঙিয়া নাম প্রকাশ করিলে তদন্ত ও অর্থনীতি দুই দিক হইতেই ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু এইসব জানিয়াও কংগ্রেস নাম প্রকাশের দাবি করিতেছে। ইহার অর্থ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসুক, তাহা কংগ্রেস চাহিতেছে না। তবে আশার কথা এই, কালো টাকা ইস্যুতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্যাঙ্কের ভূমিকা ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থার আতস কাঁচের তলায় চলিয়া আসিয়াছে। ইহাতে সুইস ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে আতঙ্ক ছড়াইয়াছে। কেননা ওই সব ব্যাঙ্ক তাহাদের ক্লায়েন্ট বা অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া জানাইয়া ছিল, তাঁহাদের তহবিল 'সুরক্ষিত আশ্রয়ে' রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী যে দেশবাসীকে তাঁহার উপর ভরসা রাখিবার আহ্বান জানাইয়াছেন, তাহা রাখা যাইতে পারে।

সুভাষিত

আপৎকালে তু সম্প্রাপ্তে যন্মিত্রং মিত্রমেব তৎ।

বৃদ্ধিকালে তু সম্প্রাপ্তং দুর্জনোঽপি সুহৃদ্ভবেৎ।। (পঞ্চতন্ত্র)

বিপদের সময় যিনি বন্ধুকে পরিত্যাগ করেন না, আগের মতোই ব্যবহার করেন, তিনিই সত্যিকারের বন্ধু। মানুষের সুখের সময় দুর্জনও বন্ধু হয়, অতএব সাবধান থাকা উচিত।

মালদহের পুলিশ-প্রশাসন প্রকৃত দোষীদের আড়াল করছে বলে অভিযোগ

সংবাদদাতা : মালদা॥ সম্প্রতি মালদা জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ হলেও এখন পর্যন্ত কোনো তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে বিস্ফোরণ স্থান যেমন পরীক্ষা করানো হয়নি তেমনি শাসক দলের প্রশাসন এইসব ঘটনাকে হালকা করে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এতে নিরাপত্তার প্রশ্নে মানুষ অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সংঘ্যালঘু ভোটের জন্য হিন্দুদের উপর আক্রমণ হলেও প্রশাসন সংখ্যালঘুদের মদত দিয়ে চলেছে। গত ২৮ অক্টোবর বিকেল চারটে নাগাদ মালদার ইংলিশ বাজার থানা সংলগ্ন মধুঘাটের হাট থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে যে ভাবে ১০-১২ জনের একটি মুসলমান দুষ্কৃতী দল পিস্তল কানে ঠেকিয়ে খাসিমারী গ্রামের লক্ষ্মণ ঘোষকে তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করল তা নজিরবিহীন। সুজাপুর ও কালিয়াচক এলাকা রাজ্যের মধ্যে জালনোট, বেআইনি অস্ত্র ভাণ্ডার, গো-পাচার ও জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। অথচ পুলিশ প্রশাসনের মদতে এইসব স্থানে বোমাবাজি, সংঘর্ষ, খুন এবং নারী অপহরণ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। সেই দিনের নৃশংস খুনের প্রতিক্রিয়াতে তিনজন সংখ্যালঘু (মালদায় সংখ্যাগুরু) সম্প্রদায়ের মানুষও খুন হয় সেইদিন রাত্রে।

আর এতেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল প্রশাসন। হিন্দু এলাকাতে অবস্থিত খাসিমারী, গোপালন কলোনী, দাসপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে শুরু হলো পুলিশি অত্যাচার। সেইদিন সন্ধেবেলাতে শিশু-সহ দু'জন মহিলাকে ও বেশ কয়েকজন ছাত্র ছাড়াও অন্য ৭ জনকে পুলিশ থানায় তুলে আনে। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পুলিশের বড় কর্তারা সুজাপুর, কালিয়াচক এবং খাসিমারী, কাঞ্চনতার, কমলাবাড়ি ও মহদীপুরে র‍্যাফ ও বি এস এফ মোতায়েন করে। সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘর ভাঙা হয়েছে কিনা জানা না গেলেও হিন্দুদের ঘরের চাল ও তালা ভাঙে পুলিশ এবং মেয়েদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। গ্রামগুলি পুলিশি অত্যাচারের ভয়ে পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। পরেরদিন মৃতদেহগুলি মর্গ থেকে উভয় সম্প্রদায় বাড়ি নিয়ে যায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য। এখানেও পুলিশ কৌশল অবলম্বন করে। শ্মশানযাত্রী যারা লক্ষ্মণ ঘোষের দেহ সৎকারের জন্য সদুল্লাপুর মহাশ্মশানে গিয়েছিল, সেই ২৮ জন দাহ শেষ করার পরে যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। খোল করতাল-সহ শবযাত্রীদের এই ভাবে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় স্থানীয় মানুষদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। হিন্দু সংগঠনের কর্মকর্তারা থানায় ছুটে যান। সাংবাদিকরাও আসেন। ২৮ ঘণ্টা পর দুই মহিলা এবং একজন ছাত্রকে পুলিশ ছেড়ে দিলেও বাকি ৩৫ জনকে পুলিশ রাত পর্যন্ত লকআপে রাখে। পরদিন অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর এদের মধ্যে থেকে নির্দোষ ৯ জনকে পুলিশ খুনের মামলার আসামি হিসাবে চিহ্নিত করে আদালতে পাঠায় এবং আইন মতোই তাদের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজত এবং পরবর্তীতে আদালত জেলে পাঠাবে। অপরদিকে পুলিশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো গোরোস্থানে হানা দেয়নি এবং মাত্র দুজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়। অর্থাৎ এখানেও বৈষম্য ধরা পড়েছে। শ্মশান থেকে যদি হিন্দু শবযাত্রীদের গ্রেপ্তার করতে পারে তবে মুসলমানদের কবর দেওয়ার সময় তাদের গ্রেপ্তার করার সাহস দেখাল না কেন পুলিশ। এ নিয়ে স্থানীয় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এদিন রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বাকি শবযাত্রীদের পুলিশ থানায় আটকে রাখে যার মধ্যে আবার চারজনকে মার্ডার কেসের আসামি হিসাবে নাকি চিহ্নিত করেছে। আইনত কোনো মানুষকে পুলিশ ২৪ ঘণ্টার বেশি থানায় আটকে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রশাসন কোনো নিয়ম কানুন মানছে না বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অপরাধ জগতের সঙ্গে মালদা জেলার সুজাপুর ও কালিয়াচকের নাম উঠে এসেছে অনেক দিন আগেই। কিন্তু কোনো সরকারই বেআইনি অস্ত্র ভাণ্ডার, অনুপ্রবেশ, জালনোট-সহ দেশবিরোধী কার্যকলাপের উপর অঙ্কুশ টানতে পারেনি। এমতঅবস্থায় আইন শৃঙ্খলা ও দুর্নীতির প্রশ্নে মালদা জেলা ক্রমশ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত দোষীকে গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে নির্দোষ মানুষ এভাবে পুলিশের জালে পড়ে তাদের সংসার ও পরিবারকে পথে বসতে দেখছে। শাসকদলের ছত্রছায়ায় এক সময়ে যারা সিপিএম করত সুজাপুর ও কালিয়াচকে এখন তারা তৃণমূল সমর্থক। ফলে প্রকৃত অপধারীরা ধরা না পড়ে ত্রাসের সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে মিল্কী অঞ্চলের ভগবানপুরের মুসলমানরা সকাল বেলাতে কীর্তন করতে যাওয়ার সময় হিন্দুদের খোল, করতাল ভেঙে মারধর করেছে গত ১৫ দিন আগে। অথচ প্রশাসন দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করে মুসলমান তোষণে ব্যস্ত রয়েছে।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সংবাদ প্রতিবেদন

আর এস এসের শিবিরে কঠোর সময়ানুবর্তিতা

সংবাদদাতা॥ সম্প্রতি আগ্রায় অনুষ্ঠিত আর এস এসের যুব সঙ্কল্প শিবিরে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে পৌঁছনোয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ভারতের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি ভি কে সিং মঞ্চের বদলে অন্য অভ্যাগতদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই বসতে বাধ্য হলেন। ওই শিবিরে তখন উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত। ওই অনুষ্ঠানে শ্রী সিং-এর দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বিষয়ে ঘণ্টা খানেকের মূল্যবান বক্তব্য রাখার কথা ছিল। সেই কারণে নির্ধারিত সময়সূচি মেনে তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা ঠিক বেলা ১১টায়। কিন্তু শ্রী সিং সভাস্থলে পৌঁছন বেলা ১২-৪০ মিনিটে। এটা কঠিন শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা পালনে অভ্যস্ত আর এস এস কর্তৃপক্ষের আদৌ মনঃপুত হয়নি। ফলস্বরূপ শ্রী সিংকে মঞ্চের বদলে অন্য অতিথিদের সঙ্গে বসতে হয়। আর এস এস সূত্রে

ভি কে সিং

জানানো হয়, সঙ্ঘের অনুষ্ঠানসূচি কখনও কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা যিনিই হোন না কেন। যেহেতু মন্ত্রী সময়ে আসতে পারেননি তাই এই অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আর এস এসের মিডিয়া বিভাগের অধিকর্তা বীরেন্দ্র বার্ষ্ণেয়'র বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের অন্যকে শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজেদেরই ঠিক করতে হবে। তাই নিয়ম সবসময় নিয়মই। আর তা সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। সংবাদসূত্র অনুযায়ী শ্রী সিং ৪০ মিনিট কোনো বক্তব্য না রেখেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সূত্রে প্রকাশ ওই শিবিরে সঙ্ঘ প্রধান শ্রী ভাগবতের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্মিত আবাসেই শ্রী সিংকে অভ্যর্থনা জানানো হয়, যা থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় মন্ত্রীর দেরিতে আসা সঙ্ঘ ভালো চোখে দেখেনি। অবশ্য তাঁর অবর্তমানে অলিম্পিকের পদকজয়ী শুটার রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর ও সুপার ৩০-র খ্যাতি সম্পন্ন আনন্দ কুমার সমবেত যুবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আর একটি পর্যায় 'শিশু স্বচ্ছতা মিশন'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আরো একটা পর্যায় শুরু করতে চলেছেন। পণ্ডিত নেহরুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালন করবে মোদী সরকার। সেই উপলক্ষে আগামী ১৪ নভেম্বর 'শিশু স্বচ্ছতা অভিযান' শুরু করার কথা প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে ১৪ থেকে ১৯ নভেম্বর 'শিশু স্বচ্ছতা মিশন' পালন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' ইতিমধ্যেই দেশে একটি জনআন্দোলনের রূপ নিয়েছে। তাতে সাড়া দিয়ে দেশের পূজ্য সাধুসন্ত, রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সহ সাধারণ মানুষও হাতে ঝাড়ু তুলে নিয়ে এই সেবাযজ্ঞে সামিল হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে পণ্ডিত নেহরুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য একটি কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। তাতে কংগ্রেসের গুলাম নবি আজাদ, মল্লিকার্জুন খারগে, করণ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ অরুণ জেটলি, স্মৃতি ইরানি ও শ্রীপাদ নায়েকের মতো মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ৫টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়— (১) সারা বছরই পালিত হবে 'শিশু স্বচ্ছতা বর্ষ' হিসেবে। (২) এই উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো হবে। (৩) 'চাচা নেহরু'র জীবন ও কাজ থেকে যুবসমাজ যাতে প্রেরণা পায় সেরকম কর্মসূচি নেওয়া হবে। (৪) সাধারণ মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং (৫) পণ্ডিত নেহরুর নামে একটি স্মারকমুদ্রা চালু করা হবে।

কমিটির সব সদস্যই প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। কংগ্রেস নেতা করণ সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ খুবই ইতিবাচক এবং গঠনমূলক। প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-য়ের নেতৃত্বে কর্মসূচি রূপায়ণ কমিটির বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি স্থির করা হবে।

সংবাদ প্রতিবেদন

লন্ডনে পচা ডিম, সোডার বোতল ছুঁড়ে অভ্যর্থনা বিলাওয়াল ভুট্টোকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুলতান মেহেমুদ চৌধুরী নতুন করে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে বৃটেনের মধ্যস্থতার অছিলায় সম্প্রতি লন্ডনে 'মিলিয়ন মার্চ' নামে এক সম্ভাব্য বিশাল মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। লন্ডন শহরের ব্যস্ত এলাকা ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট অবধি ছিল মিছিলের নির্দিষ্ট গন্তব্য। নামে 'মিলিয়ন' অর্থাৎ কম করে ১০ লক্ষ লোকের অংশ নেওয়ার আহ্বান থাকলেও আদতে কয়েকশো লোককেও আহ্বায়করা জোটাতে পারেননি। এরই মাঝে ঘোলা জলে মাছ ধরতে সভাস্থলে হাজির হন প্রাক্তন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী ও পি পি পি দলের নিহত প্রধান বেনজির ভুট্টোর পুত্র বিলাওয়াল ভুট্টো। মিছিল তখনও শুরু না হওয়ায় সেখানকার চটজলদি মঞ্চকে ভারত-বিরোধী বক্তব্য রাখার উদ্দেশে ব্যবহার করতে বিলাওয়াল তড়িঘড়ি মঞ্চে উঠে পড়েন। কিন্তু বক্তব্য রাখা দূরের কথা তিনি উঠতে না উঠতেই জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকে এই পদযাত্রা কাশ্মীরীদের মঙ্গলের জন্য, এখানে বিলাওয়ালের কোনো স্থান নেই। এখানেই না থেমে কট্টর বিলাওয়াল-বিরোধী জনতার একাংশ তাঁর উদ্দেশে পচা ডিম, বোতল, টিনের ক্যান ছুঁড়ে আক্রমণ করে। জনৈক মিছিলকারীর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ইংল্যান্ডের ডার্বি অঞ্চল থেকে এতদূর এসেছেন বিলাওয়াল্লের বেলাল্লাপনা দেখতে নয়। উপর্যুপরি গালিগালাজ ও আক্রমণের মুখে বেগতিক দেখে বক্তব্য না রেখেই পুলিশের সহায়তায় সেখান থেকে চম্পট দেন বেনজির-পুত্র। পুলিশ তাঁকে এমনও বলে যে দেরি করলে তাঁর প্রাণ সংশয়ও হতে পারে।

প্রসঙ্গত এই বিলাওয়াল ইতিমধ্যেই মুলতানে সমগ্র কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার আধা-উন্মাদ ভাষণ দেওয়ার সুবাদে ভারতে চরম কুখ্যাত হয়ে পড়েছেন। তবে, নামে ডাউনিং স্ট্রিটের নিশানায় 'মিলিয়ন

মার্চ' হলেও কাগজে কলমে গুটিকয়েক লোক শেষমেশ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিল। উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী মিছিলটির উদ্দেশ্য ছিল ভারত সরকারের ওপর চাপ বাড়ানো। যাতে বৃটিশ মধ্যস্থতায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়। বন্ধ হয় পাক্ অধিকৃত কাশ্মীরে 'তথাকথিত' মানবাধিকার লঙ্ঘন। এই মর্মে পি ও কে-এর প্রাক্তন প্রধান বৃটিশ সংসদে এই নিয়ে আলোচনারও দাবি জানিয়েছিলেন। সূত্র অনুযায়ী ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বৃটিশ বিদেশ দপ্তরের সেক্রেটারি ফিলিপ হ্যামন্ডের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারেই এই ভারত-বিরোধী মিছিলকে রুখে দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে হ্যামন্ড তাঁকে (সুষমাকে) আশ্বস্ত করেন যে কোনো অবস্থাতেই কাশ্মীরের ব্যাপারে বৃটেন কোনো রকম হস্তক্ষেপের রাস্তায় যাবে না। অবশ্য তিনি শান্তিপূর্ণ মিছিল হলে তাকে আটকাবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। উল্লেখ্য, এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বৃটিশ উপ-প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বৃটিশ বিদেশ দপ্তরের নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী এই মর্মে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে কোনো অবস্থাতেই বৃটেন কাশ্মীর সমস্যায় নাক গলাবে না। এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি অতি দীর্ঘমেয়াদী দ্বিপাক্ষিক সমস্যা যা কেবলমাত্র উভয় দেশই নিজেদের মধ্যে সমাধান করতে পারে— এখানে বৃটিশ মধ্যস্থতার কোনো স্থান নেই।

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

আরাবুল বহিষ্কৃত ছ'বছর
৬ বছর পর দলটা থাকবে তো ?

মাননীয় আরাবুল ইসলাম
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পদ
ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
স্যার,

শুরুতেই আপনার জন্য আমার সহমর্মিতা জানাই। দল আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। দিদিকে আমি ভালোবাসি, ভয় পাই। ঠিক আপনার মতো। তাই গোপনে চিঠি লিখছি। আশা করি আপনি গোপন রাখবেন।

দাদা, আপনি এতকাল দলের সম্পদ ছিলেন। কিন্তু আজ হঠাৎ করে আপনাকে ছেঁটে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। দিদি একে তাকে ধরে ধরে সারা বছর পুরস্কার দিচ্ছেন। দলের লোককে তো বটেই বাইরের লোককেও পুরস্কার দিয়ে দলের করে নিচ্ছেন। কিন্তু আপনি পুরস্কৃত হওয়ার বদলে বহিষ্কৃত হলেন। এটা সত্যিই অন্যায়। তবে এ রাজ্যে দিদি যেটা করেন সেটাই ন্যায়, সেটাই নীতি। তবুও গোপনে বলছি এটা কিন্তু মোটেও ঠিক হয়নি।

সেই যেদিন আপনি এক দিদিমনিকে জগ ছুঁড়ে মারলেন সেদিন থেকে আমি আপনার ফ্যান। সত্যি আপনার হাতের কী টিপ মাইরি! একেবারে ঠিক নিশানায় ছুঁড়েছিলেন। একটুও এদিক ওদিক নয়। আপনি তো সেদিন ওই শিক্ষিকাকে শাসন করার জন্য পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মারতে পারতেন। মারেননি। জগের জলটাও টিপ করে দিদিমণির গায়ে ফেলে কেলেঙ্কারি বাঁধাতে পারতেন। কিন্তু আপনি তা করেননি। নিছকই জগ ছুঁড়ে জগিং করেছেন। দিদি অবশ্য সেবার আপনাকে তেমন বকেননি। পিঠ চাপড়ে না দিলেও শত সমালোচনার মুখে আপনার মতো প্রাক্তন বিধায়ককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কারণ তখন দিদি জানতেন আরাবুলকে দরকার। তখন সামনে পঞ্চায়েত ভোট। আপনি ছাড়া কে উদ্ধার করবে দলকে!

এরপর সিপিএম নেতা (এখন তিনিও বহিষ্কৃত) আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাকে যখন পেটালেন, থানায় ঢুকে একে তাকে শিক্ষা দিলেন তখনও দিদি মুখ বুজে ছিলেন। আপনার রাজনৈতিক গুরু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও সেবার আপনার নামে কুকথা বলা মিডিয়ার মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছিলেন। আর এক গুরু মদন মিত্র জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— আরাবুলের মতো ভালো সংগঠক হয় না।

ঠিক কথাই বলেছিলেন মদনবাবু। এখন অবশ্য তিনিও দলের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেন না। দিদির মঞ্চ থেকে অনেক অনেক দূরে গ্যালারিতে বসে থাকতে হয়। যাই হোক মদনবাবুর মতো মানুষই বুঝতে পারেন দলে আপনাদের কতটা দরকার। দিদি বুঝতে পারেন না এমনটা অবশ্য নয়। তবে এবার আপনাকে সরানোর সিদ্ধান্তটা নিতেই হলো দিদিকে।

একসঙ্গে তিন জন সংখ্যালঘু মানুষ খুনের পর কিছুতো একটা করতেই হয়। কাউকে তো একটা বলির হাড়িকাঠে চড়াতেই হয়। অনুব্রত, মনিরুলকেও সরানো যেত। কিন্তু এখন আপাতত একজনকে বহিষ্কার করেই কাজ সারলেন দিদি। বিশ্বাস করুন, আমি জানি আপনাকে দিদি মন থেকে সরাননি। একটু অপেক্ষা করুন, দিদি ঠিক ফিরিয়ে আনবেন। দিদির পরামর্শে দিদিকে যে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন তাতেই কাজ হবে। তবে সময় লাগবে। এখন দিদি-দাদাদের সময় একদম ভালো যাচ্ছে না। সবাই 'আপনি বাঁচলে...' নীতিতে ভরসা করছেন। তাই একটু সময় দিতেই হবে।

আপনাকে ছ'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপর অনুব্রত, মনিরুলদের মতো সম্পদদের একে একে বহিষ্কার করা হলে দলে আর থাকবেটা কী? বিশেষজ্ঞরা টিভিতে বসে যতই ভারী ভারী পর্যালোচনা করুন না কেন দিদি ভালোই জানেন যে ভোটে জেতার আসল ভরসা আপনারাই। তাই আরাবুলরা ছ'বছর দলের বাইরে থাকলে বছর ছয়ের পর দলটাই তো থাকবে না। আপাতত গ্রাম নির্ভর ভোট নেই। তাই এখন ফেরার আশা ছেড়ে একটু রেস্ট নিন। বিধানসভার আগে দলীয় তদন্তে আপনি ঠিক নিরাপরাধ বলে ছাড় পেয়ে যাবেন। মনে রাখবেন আরাবুল ভাই, নানা দুর্নীতি, কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনায় এখন দিদির কাছে একটাই বড় প্রশ্ন— ছ'বছর পর দলটা থাকবে তো?

— **সুন্দর মৌলিক**

আত্মপ্রচারের স্বার্থে টিভি নয়, দেশের মানুষকে পাশে পেতেই বেতার ভাষণ মোদীর

দেশে লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয় ২০ মে এবং প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী শপথ নিয়েছেন ২৬ মে। অর্থাৎ কম বেশি পাঁচ মাস মোদী-সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী গত ২ নভেম্বর, রবিবার সকাল ১১টায় দেশবাসীর কাছে তাঁর মনের কথা বলেছেন। একটু খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে টিভি ক্যামেরার সামনে লাইভ সম্প্রচার করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচার জোরদার হোত। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর মনের কথা প্রচারিত হয়েছে রেডিওতে। কারণ দেশের দরিদ্র মানুষের ঘরে রঙিন টিভি নেই। আজও ভারতের বহু প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। সেখানে মানুষ ট্রানজিস্টার রেডিওতে খবর শোনে। টিভির সম্প্রচার সাধারণভাবে বিশেষ সুবিধাভোগী শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ। নরেন্দ্র মোদী দেশের অবহেলিত দরিদ্র মানুষকে পাশে পেতে চান। তাই তাঁর বেতার ভাষণে গালভরা বড় বড় কথা বলেননি। শুধু বলেছেন, দেশের উন্নয়নের অভিমুখ কী হবে সে বিষয়ে আপনাদের কথা আমাকে লিখে জানান। আপনাদের মতামত জেনে সেই পথেই আমি সংস্কারে ব্রতী হবো। গরিব মানুষ জানে দারিদ্র্যের কষ্টটা কী। তাই কীভাবে সরকার কাজ করলে তাঁদের আর্থিক উন্নতি হয় সে কথা তাঁরাই বলবেন। দিল্লীর ঠাণ্ডা ঘরে বসা আমলারা নয়। বলেছেন, একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রের চিঠিতে তিনি জানতে পারেন বিদ্যালয়ের সাধারণ শৌচাগার ব্যবহারে কতটা অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়েছেন দেশের প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ শৌচাগার নির্মাণে জরুরিভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করতে। একটা কথা বলে রাখা ভাল যে মোদী তাঁকে পাঠানো প্রতিটি ই-মেল এবং চিঠি নিজে পড়েন। এক্ষেত্রে তাঁর দপ্তরের আমলাদের নাক গলাতে দেন না।

মনমোহন সিংয়ের কংগ্রেস সরকারের আমলের শেষ দু'টি অর্থবর্ষে দেশের আর্থিক

গূঢ়পুরুষের

কলম

বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশের নীচে ছিল। চলতি বছরের এপ্রিল— জুন এই তিন মাসে আর্থিক বৃদ্ধির হার বেড়ে ৫.৭ শতাংশ হয়েছে। কথাটা আমার নয়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্স বিশ্বের ২০ জন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদকে দিয়ে ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে সমীক্ষা করেছে। উদ্দেশ্য ছিল মোদীর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তব আর কতটা নির্বাচনী প্রচার তা জানার। সমীক্ষক অর্থনীতিবিদরা জানিয়েছেন চলতি আর্থিক বছরে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি হবে ৫.৫ শতাংশ এবং পরের আর্থিক বছরে তা বেড়ে হবে ৬.৪ শতাংশ। মোদী শপথ নেওয়ার পর থেকেই ভারতে বিপুল বিদেশি বিনিয়োগ আসতে শুরু করেছিল। পাঁচ মাস পরে শেয়ারবাজারের নিরিখে ভারতের বাজার এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাজারগুলির অন্যতম বলে সমীক্ষকরা জানিয়েছেন। স্কটিয়া ব্যাঙ্কের প্রবীণ অর্থনীতিবিদ টুলি ম্যাককালি বলেছেন, 'ভারতের মোদী-সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের যে কাজ শুরু করেছেন তার ফলে ভারতীয়দের মানসিকতায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। অবশ্যই আমরা আরও বেশি সংস্কার দেখতে চাই। তবে এখনও পর্যন্ত যা হয়েছে তাতে আমি অন্তত বেশ খুশি'।

মাত্র পাঁচ মাস ক্ষমতায় এসেই মোদী-সরকার কয়লায় বেসরকারি বিনিয়োগ ও ডিজেল থেকে ভরতুকি তুলে দিয়ে তা বাজারদরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন বলেছেন, 'বিদেশি লগ্নিকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে ২০১৬ সালের মধ্যে খুচরো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারবে মোদী-সরকার।' বিপদ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে। এখানে মমতার সরকার আর্থিক সংস্কার ও শিল্পোন্নয়নে আদৌ আগ্রহী নয়। রাজ্যের বঞ্চিত গরিব মানুষকে নয়, চিত্র তারকাদের কোটি কোটি টাকা উপহার দিতে মুখ্যমন্ত্রী বেশি আগ্রহ দেখান। টিভি সিরিয়ালের প্রযোজককে তিনি রাতারাতি রাজ্যের মস্ত বড় শিল্পপতি বানিয়ে দিয়েছেন। অথচ এই রাজ্যের পাট শিল্পের সঙ্গে বহু লক্ষ মানুষ যুক্ত আছেন। ভারতের মোট ৮৪টি পাটকলের মধ্যে ৬৪টি পাটকল আছে শুধু পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের পাটকলগুলির উৎপাদন কমতে কমতে এখন ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন। মোদী সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর লাগাতার চিঠি পাঠাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। মোদী সরকার চাইছে এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় জুট প্যাকেজিং আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হোক। জুট প্যাকেজিং আইনে ধান ও আলু রাখতে পাটের বস্তা ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। পশ্চিমবঙ্গে এই আইন মানা হয় না। মানলে পাটকলগুলিকে উৎপাদন হ্রাস করতে হোত না। লক্ষ শ্রমিক বেকার হতেন না।

কোনো সন্দেহ নেই মোদী সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে উন্নয়ন বিরোধী রাজ্যে পরিণত করেছেন।

কেশরী পত্রিকা, দেশপ্রেমী সাভারকর ও কংগ্রেসের ঘৃণ্য খেলা

দেবব্রত ঘোষ

সম্প্রতি কেরল থেকে প্রকাশিত আর এস এসের পত্রিকা কেশরীতে ছাপা একটি নিবন্ধকে কেন্দ্র করে মিডিয়া এবং কংগ্রেস ঝড় তুলেছে। নিবন্ধটিতে নাকি বলা হয়েছে নাথুরাম গডসের উচিত ছিল গান্ধীজীর বদলে নেহরুকে হত্যা ('টার্গেট') করা। রাজনৈতিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক নিবন্ধের খানিকটা অংশ পড়ে এবং না বুঝে পড়েও তারও আংশিক উদ্ধৃতি তুলে সেটার অপব্যাখা করে আলোড়ন তুলে দেওয়াটা পরিবারতান্ত্রিক কংগ্রেস দলটার মজ্জাগত। সাভারকর জানতেন অকারণ সংখ্যালঘু তোষণ দেশকে খণ্ডিত করবেই। কংগ্রেস দলের কর্ণধারদের মদতে ও সম্মতিতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করবে সেই বিষয়ে বীর সাভারকর অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ইংরেজ আমলে পরাধীন দেশেই শুধু নয়, স্বাধীন ভারতে নেহরু জমানাতেও সাভারকর দীর্ঘকাল কারাবন্দী ছিলেন। কারণ অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও নেতাজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই মানুষটি সংখ্যালঘু তোষণের বিরুদ্ধে চির সোচ্চার ছিলেন। ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রমাণ করে ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতার পেছনে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস কোন নক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছিল।

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার একটা অধিবেশনে (কর্ণাবতী, গুজরাট) বীর সাভারকর একটা ভাষণ দিয়েছিলেন যার বাংলা অনুবাদ হলো— "জাতি হিসেবে হিন্দুরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি দেশপ্রেম ও আনুগত্য বজায় রেখে সমস্ত দেশবাসীর প্রতি সমদৃষ্টি রেখে মাতৃভূমির প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। কিন্তু যদি দেশের মুসলমান অধিবাসীরা হিন্দুদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অত্যাচারের পথ বেছে নেয় এবং সনাতন

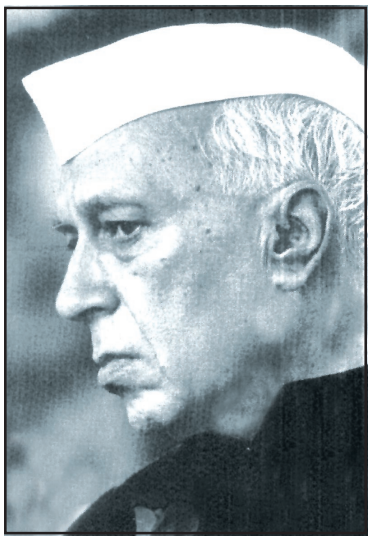

নেহরু বিপ্লবী নন কিন্তু বিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করার লোভ কখনো সংবরণ করতে পারেননি। বিপ্লব বা সংগ্রাম নেহরুর রক্তে-মাংসে ছিল না এমনকী চামড়াতেও নয়, ছিল কেবল পোশাকে, যে পোশাকের চুমকির আলোয় নিজেকে উজ্জ্বল দেখতে ভালবাসতেন আবার ভেতরে ঘেমে অস্থির হয়ে উঠতেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যকে আক্রমণ করে, জবরদস্তি করে সমগ্র দেশে গোঁড়া ইসলামি আইনকানুন ও মুসলমান প্রাধান্য চালু করতে চায় এবং ভারতবর্ষকে বিপন্ন করে তুলতে চায় তাহলে হিন্দুদের একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য লড়াই করতে হবে— শত্রুপক্ষ মুসলমান, খৃস্টান বা অন্য যারাই হোক না কেন।" সাভারকরের কাছে দেশ ও জাতি আগে তারপরে ধর্ম এবং ভারতীয় হিন্দুধর্ম যে পৃথিবীর উদারতম ও সর্বংসহা ধর্ম সেই বিশ্বাস ও বোধে স্থিত থেকেই সাভারকর যথার্থ ভারতীয়।

দেশভাগের সময় একটা চুক্তি হয়েছিল— অখণ্ড ভারতের কোষাগারে যে অর্থ জমা ছিল তার ৩৩ শতাংশ (৫৫ কোটি টাকা) পাকিস্তানকে দেওয়া হবে এবং অন্যান্য সম্পত্তির ৩৩ শতাংশ পাকিস্তান পাবে। তার মধ্যে কলকারখানা সমেত অন্যান্য সম্পত্তি ইত্যাদি যার এলাকায় যা পড়েছে তার মূল্য নির্ধারণ করে নিজেদের প্রাপ্যর চেয়ে বেশি হলে সেই দেশ নগদ মূল্যে অন্য দেশকে ফিরিয়ে দেবে। মোট ঋণের ১৭.৫ শতাংশ (৩০০ কোটি টাকা) পাকিস্তানকে বহন করতে হবে ৪ কিস্তিতে, যেখানে ভারতকে ঋণের ৮২.৫ শতাংশ শোধ করতে হবে। সেই অনুযায়ী পাকিস্তানের কাছে ভারতের ২৭ কোটি প্রাপ্য হয় যা পাকিস্তানকে মুকুব করে দেওয়া হয়েছিল, উপরন্তু গান্ধীজীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, নেহরুর সম্মতিতে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল যেটা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র কিনে পাকিস্তান ভারতকেই আক্রমণ করেছিল। সাভারকর এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন এবং নাথুরাম গডসের গান্ধী-হত্যার পেছনে যে কারণগুলো কাজ করেছিল এই চুক্তি তার অন্যতম কারণ, যদিও গান্ধী হত্যার জন্য সাভারকর বা আর এস এস কোনো ভাবেই দায়ী ছিল না।

ফাঁসীর মঞ্চে ওঠার আগে নাথুরাম গডসে বলেছিলেন ''নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে ত্বয়া হিন্দুভূমে সুখং বর্ধিতো'হম্, মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে ত্বদর্থে পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে (হে প্রিয় মাতৃভূমি, তোমায় প্রণাম। হে হিন্দুভূমি তোমারি কোলে লালনে আমি বেড়ে উঠেছি সুখে, হে সর্বমঙ্গলময়ী পুণ্যভূমি, আমি তোমার কাজে জীবন উৎসর্গ করলাম। মা তোমায় প্রণাম।)'' এর পরের কথাটাই ছিল অখণ্ড ভারত জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম্। এটা তো সত্যিকারের দেশপ্রেমীর কথা। ভারতবর্ষকে কেন খণ্ডিত হতে দিয়েছিলেন নেহরু, কেনই বা গান্ধীজী ভারতবিভাজন মেনে নিয়েছিলেন? আগে দেশ ও জাতি তারপর ব্যক্তি। গান্ধীজী যতো বড় মহৎ ব্যক্তিই হোন, তাঁর স্থান ভারতবর্ষের নীচে, ওপরে নয়। নেহরুর ক্ষেত্রেও তাই। আমি হিংসা বা ব্যক্তিহত্যার সমর্থক নই, গান্ধীহত্যার সমর্থকও নই, কিন্তু নাথুরাম গডসে গান্ধীহত্যার পেছনে যে কারণগুলোর উল্লেখ করেছিলেন আদালতে দাঁড়িয়ে, সেগুলোর যুক্তিও অনস্বীকার্য ছিল। কংগ্রেস নোংরা খেলায় চির অভ্যস্ত কিন্তু আজকের কংগ্রেসের নোংরামি তো অতীতকেও অতিক্রম করে গেছে।

দেশে যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেইসব রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি নেই বা একেবারেই নগণ্য, অথচ অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বেড়ে চলেছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ। তার প্রমাণ বর্ধমানের খাগড়াগড়, শিমুলিয়া-সহ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামি মৌলবাদী জিঘাংসা। সদ্য যুক্ত পাড়ুই গণহত্যার শেষতম উদাহরণ যেখানে কংগ্রেস-সিপিএম ও বর্তমান শাসক দলের প্রতি বীতস্পৃহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের আশায় বিজেপিতে নাম লিখিয়েছিলেন, তারা নিহত হলেন— সৌজন্য বীরভূমের রাজাধিরাজ অনুব্রত মণ্ডল, ঠিক যেভাবে ভাঙড়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল— সৌজন্য রাজাধিরাজ আরাবুল ইসলাম। আজ বর্তমান শাসক দলের প্রতিহিংসামূলক কাজের সঙ্গে সিপিএম জমানার ৩৪ বছরের অপশাসন ও তার আগের দেড় দশকের কংগ্রেসী অপশাসনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এটাকে আড়াল করার জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ অপপ্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস- সিপিএম এবং মিডিয়ার কিছু অংশ।

সাভারকর-সহ হিন্দু মহাসভার সমস্ত সদস্য বন্দেমাতরম্ গানটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন অথচ মেকি ধর্মনিরপেক্ষ নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের তাবড় নেতারা বন্দেমাতরম্ গানটিকে উচ্ছেদ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ১৯৩৭ সালে নেহরু লিখেছেন যে, বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীতের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ এটি কঠিন শব্দে পরিপূর্ণ ও গানটির ভাব প্রগতি এবং জাতীয়তা সম্বন্ধে আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে মেলে না। সহজ সাবলীল ভাষায় অধিক উপযোগী জাতীয় সঙ্গীত সন্ধানের প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে। নেহরু বললেন বন্দেমাতরম্ গানটির শেষ অংশের হিন্দুধর্মীয় ভাব ও ইঙ্গিত তার নিজের অপছন্দ, কারণ গানের ওই অংশটুকু মনে কলুষতার বাতাস বইয়ে দেয়। নেহরুর আপত্তি এই যুক্তিতে যে মুসলমানরা বন্দেমাতরম্ গানটির বিরোধী। বাংলা ও মহারাষ্ট্র এই দুই রাজ্যে বন্দেমাতরম্-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিস্তর লেখালেখি ও আন্দোলন হয়েছিল। মারাঠা পত্রিকায় লেখা হয়েছিল Let Bengal remember the partition days. We assure Bengal that Maharastra stands by her side in the fight for Bande Mataram **(Savarkar)**। নেহেরু বললেন, ''বন্দেমাতরম গানের পৌরাণিক ও ধর্মীয় ভাব ও চিত্র অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণীয় নয়। ভারত বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দেশ। আমাদের সবার অনুভূতির কথা ভাবতে হবে। ধর্মের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই, ধর্মের কথা এলেই আমি বন্দেমাতরম্ ভুলে যাই।'' এটা ধর্মনিরপেক্ষ উক্তি নয় বরং সাম্প্রদায়িকতাকে তোল্লাই দেওয়া উক্তি যার বিরোধিতা সাভারকর করেছেন। আমাদের তো একটাই জাতি যার নাম ভারতীয়। অথচ জাতি-উপজাতি, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আঞ্চলিক প্রাদেশিকতার অসংখ্য বিভাজনে এক ক্রমবর্ধমান বিভেদকামিতা আমাদের দেশকে ক্লিন্ন করে তুলছে। এই অবক্ষয় শুরু হয়েছিল নেহরু জমানা থেকে।

নেহরু বিপ্লবী নন কিন্তু বিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করার লোভ কখনো সংবরণ করতে পারেননি। বিপ্লব বা সংগ্রাম নেহরুর রক্তে-মাংসে ছিল না এমনকী চামড়াতেও নয়, ছিল কেবল পোশাকে যে পোশাকের চুমকির আলোয় নিজেকে উজ্জ্বল দেখতে ভালবাসতেন আবার ভেতরে ঘেমে অস্থির হয়ে উঠতেন। নেহরু অনেক ভুল করেছেন, স্বাধীনতার আগেও এবং পরেও।

নেহরুর প্রথম মারাত্মক ভুল ১৯৩৭ সাল যা ভারত বিভাগের জন্য মুসলিম লীগের দাবির শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল ১৯৪০ সালে যখন তিনি বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে অস্বীকার করলেন। তৃতীয় মারাত্মক ভুল ১৯৪৬ সালে যখন তিনি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেও পরে সরে এলেন। ভারতবর্ষ বিভাজনের দায় নেহরু এড়াতে পারেন না।

ঐতিহাসিক প্রমাণে বলা চলে ভারত বিভাগ অপরিহার্য ছিল না এবং যাদের ভুল পদক্ষেপ ও আপোশকামিতার জন্য দেশ ভাগ হয়েছিল তাদের অন্যতম নায়ক ছিলেন নেহরু। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ সরকার যখন মুসলমানদের জন্য পৃথক-নির্বাচন কেন্দ্রের প্রস্তাব আনলো কংগ্রেস, বিশেষ করে নেহরু তা খারিজ না করে, মেনে নিয়ে প্রকারান্তরে দ্বিজাতিতত্ত্বকে মেনে নিলেন (যেটা জিন্না তখনো করেননি)। নির্বাচনের পর জিন্নার প্রস্তাব মতো কোয়ালিশন সরকার গঠনে নেহরুর জন্যই কংগ্রেসের শীর্ষনেতারা অসম্মত হন। যদি সেদিন কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতো তাহলে ভারতবিভাগ এড়ানো যেত। মৌলানা আজাদ তার India Wins Freedom বইতে লিখেছেন ''Nehru's mistake in 1937 had been bad enough"। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর বারবার কোয়ালিশন সরকার গঠনে জিন্নার প্রস্তাব নেহরু ফিরিয়ে দিয়ে মুসলিম লীগ নেতাদের ক্রোধ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভাইসরয় ওয়াভেল মন্তব্য করেছেন, ''Pakistan was the creation of Congress, for it was the refusal to

establish the coalition Government in provinces that alarmed the Muslims and drove them to extremes" বিশিষ্ট মার্কিন ঐতিহাসিক মাইকেল ব্রেচার লিখছেন ''partition of India was a voluntary choice of Nehru and his colleagues... united India was within the realm of possibility as late as April 1947"।

১৯৪০ সালের ২৫ মে নেহরু বলেছিলেন এখন যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং বৃটিশরা জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত, সেই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা উচিত নয়, কারণ সেটা হবে ভারতবর্ষের পক্ষে মর্যাদা হানিকর। অতএব স্বাধীনতা আন্দোলন প্রত্যাহার। এটা

রাসবিহারী বসু

যদি অহিংসা নীতির জন্যই হয়ে থাকে তবে নাথুরাম গডসের বেলায় সেই নীতি প্রয়াগ করা হল না কেন? ১৯৪৬ সালে যখন পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব দিয়েছিল ভারতবর্ষকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেল হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা আর যোগাযোগ এই তিনটি মাত্র দপ্তর আর বাদবাকি সব দপ্তরের দায়িত্ব তিনটি গ্রুপে বিভাজিত প্রাদেশিক সরকারের হাতেই থাকবে। তিনটি গ্রুপের মধ্যে এ গ্রুপে থাকবে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলো, বি গ্রুপে থাকবে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মতো মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলো এবং সি গ্রুপে থাকবে বাংলা ও অসম, যেখানে মুসলমানদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পক্ষে পাকিস্তানের দাবি ছেড়ে দিয়ে জিন্না এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন, কারণ জিন্না বুঝে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের আশা ত্যাগ করাই ভাল। এবার নিজের অপরিসীম ঔদ্ধত্যে নেহরু মারাত্মক ভুল করলেন। ১০ জুলাই মুম্বাইতে সাংবাদিক সম্মেলন করে নেহরু বলে বসলেন একবার ইংরেজদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে গেলে কংগ্রেস আর এই গ্রুপিং মানবে না।

মৌলানা আজাদ বলেছিলেন নেহরুর ভ্রান্ত পদক্ষেপ মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি

বীর সাভারকর

করেছে। নেহরুর এই মন্তব্য সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সারা দেশে। জিন্না অবিভক্ত ভারতের বদলে মুসলমানদের জন্য পৃথক পাকিস্তনের দাবিতে ফিরে গিয়ে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের ডাক দিলেন যা থেকে তাকে আর ফেরানো যায়নি, কারণ নেহরুর এই মন্তব্যের পর জিন্না আর কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে পারেননি। বারবার নেহরু ভুল করে গেছেন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। ঐতিহাসিক লিওনার্ড মোসলকে নেহেরু লিখছেন— "The truth is that, we were tired men and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again and

নেতাজী সুভাষ

if we have stood out for a United India, as we wished it, prison obviously awaited us।" কী চমৎকার যুক্তি, শরীরকে ক্লান্তি গ্রাস করছিল তাই আর স্বাধীনতা সংগ্রাম নয় বরং হাত পেতে দয়ার দান যা পাওয়া যায় তাতেই বর্তে গিয়ে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে গেলেন নেহরু।

নেহরু শরীর থেকে একবিন্দু রক্ত না ঝরিয়ে, শরীরে পুলিশের ডাণ্ডার আঘাত না খেয়েও ক্লান্তির দোহাই দিয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে ক্ষমতার মোহে আপোশ করলেন বৃটিশের বিভাজনি কূটনীতির কাছে। নেহরুর দেশপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন চলে আসে এখানেই। নেহরুর আপোশকামিতা আর ক্ষমতালোভ একই সঙ্গে কাজ করে যায়। সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান লিখেছেন— on the basis of communal feelings, once in the momentary absence of Subhas Bose, India was divided giving solution of it, to the nation being so much so as afraid of Netaji Subhas that he might come back one day...(Times of India 6.4.1970)। গান্ধীবাদী বাদশা খান সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন কংগ্রেসের মেরুদণ্ডহীন আপোশকামিতার। ১৯৪৫ সালের ২৯ আগস্ট নেহরু লিখছেন— সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে যুদ্ধপরাধীদের মতো ব্যবহার করা উচিত, কারণ সুভাষচন্দ্র বসু ও তার লোকজন বহু ইংরেজ ও আমেরিকান মানুষকে হত্যা করেছে এবং সুভাষচন্দ্র বসু জোর করে বার্মা ও মালয়ে

অনেক নিরীহ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করেছে। নেহরু কী করে ভুলে থাকেন তাঁর প্রিয় ইংরেজ অংসখ্য ভারতবাসীকে হত্যা করেছে।

আগেও নেহেরু বলেছেন— The way Subhas Bose has chosen is naturally wrong which I cannot accept but must resist. Subhas Bose is a Fascist, if he comes back, I shall resist him with an open sword. এই ছিল ভারতভাগ্য বিধাতা নেহেরুর আসল চেহারা যা অক্ষম হিংসা, ঈর্ষা আর বিদ্বেষবোধে জীর্ণ। নেহরু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে চিঠি লিখে বলছেন"— understand from a reliable source that Subhas Chandra Bose, your war criminal has been allowed to enter Russian's territory by Stalin. This is a clear betrayal and treachery of faith by the Russians as Russia had been an alley of British and Americans allied army, it should not have been done. Please take note of it and do what you consider proper and fit" কী চমৎকার! এটা কি কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামীর চেহারা নাকি আপাদমস্তক ঈর্ষায় জর্জরিত মানুষের প্রলাপ?

নেহরু জমানায় ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল— দিল্লী থেকে All India Radio সারাদিন ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ধরে ধরে সম্মান জানানো হয়েছে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কিন্তু একবারও নেতাজীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৫৩ সালে ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের তথ্যচিত্রে ভারতের প্রায় সব জাতীয় নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি এবং তাঁদের অবদানের ওপর তথ্যাবলী প্রদর্শিত হয়েছিল কিন্তু সাভারকর, রাসবিহারী বসু, নেতাজীর ছবি কিংবা নাম একবারও উল্লেখিত হয়নি। নেহরুর পারিবারিক উত্তরাধিকারীরাও এই পরম্পরাকেই বহন করছেন, আজও। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের অডিও ভিস্যুয়াল পাবলিশিটি ডাইরেক্টর পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, সেই প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি টাঙানো ছিল— ইন্দিরা গান্ধীর ২৫টি, নেহরুর ১৬টি, গান্ধীজীর ৬টি ছবি— সাভারকর, রাসবিহারী বসু, নেতাজীর একটাও ছবি টাঙানো ছিল না।

১৯৪৯ সালে মুজাফরপুরে শহীদ ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করতে নেহরু অস্বীকার করেছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে ক্ষুদিরাম হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই নেহরুর সামনেই মাউন্টব্যাটেন সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর শহীদদের স্মৃতিতে নির্মিত শহীদবেদি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর কোনো সুসভ্য দেশ শহীদবেদি গুড়িয়ে দেয় না, বৃটিশরা দিয়েছিল এবং সেটা নেহরুর প্রাণের বন্ধু মাউন্টব্যাটেন। স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেস নেহরুর নেতাজী-বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়েছিল, কারণ তখন নেহেরুই কংগ্রেসের শেষ কথা এবং নেহরু-পরবর্তী কংগ্রেস (ইন্দিরা কংগ্রেস, রাজীব কংগ্রেস, সোনিয়া কংগ্রেস হয়ে রাহুল কংগ্রেস) সেই পরম্পরাকেই বহন করছে যার নাম দেশ ও জাতি চুলোয় যাক, 'ভারতবিদ্বেষী সংখ্যালঘু' তোষণবাদ জিন্দাবাদ, কিন্তু সংখ্যালঘুরা জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমী হলে তারা মুর্দাবাদ। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর, মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

নরেন্দ্র মোদীর ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’

অর্ণব নাগ ॥ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তখনও অভিষেক হয়নি তাঁর। কিন্তু তার মধ্যেও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ার নানাবিধ পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ ছিল স্বচ্ছ-ভারত গড়ার ভাবনা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নরেন্দ্র মোদীর এই ভাবনা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। কারণ শৌচালয়ের অভাবের মূল্য ভারতকে ভালোভাবেই দিতে হচ্ছে। ভারতের জিডিপি এই মুহূর্তে ৬.৪ শতাংশ। এই মুহূর্তে দেশের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাতে আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু উপযুক্ত শৌচালয়ের অভাব ও দূষণ-যুক্ত পরিবেশের কারণে চিকিৎসার খরচ ক্রমাগত বেড়েছে এবং আনুপাতিক হারে উৎপাদনশীলতাও কমেছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের জিডিপি পড়তির দিকে চলে গিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা এও বলছে, উপযুক্ত শৌচালয় থাকলে প্রতি বছর বার্ষিক মাথাপিছু (ক্যাপিটা) আয় অন্তত ৬০০০ টাকা বাড়তে পারত। সহজবোধ্য কারণেই স্বচ্ছ ভারত না গড়লে সমৃদ্ধ ভারতের ভাবনাকে যে বাস্তব রূপদান একপ্রকার অসম্ভব, তা মোদীর বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

তাই গত ২ অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিনে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা হয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। মোদীর রাজনৈতিক পূর্বসূরি স্বনামধন্য অটলবিহারী বাজপেয়ীও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। মূলত ১৯৯৯ সাল থেকেই গ্রাম্য শৌচালয় নির্মাণ দেশের অর্থনৈতিক নীতির সহায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছিল। শৌচালয় নির্মাণ আন্দোলনের সূচনা হয় তখন থেকেই। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এব্যাপারে সেই সময় থেকেই বরাদ্দ বাড়তে থাকে। বছর দু'য়েক আগে ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের নেতৃত্বে

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নির্মল ভারত অভিযানের সূচনা করে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। কিন্তু বিদায়ের শেষলগ্নে আপাদমস্তক দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত এই সরকারের এহেন কর্ম বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। আর সবচেয়ে বড় কথা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের এই ভাবনার পেছনে পরিকল্পনার ছাপও সুস্পষ্ট।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গ্রামের ৬৭ শতাংশ বাড়িতে কোনো শৌচালয় নেই। দেশের অন্তত ৬০ কোটি মানুষ শৌচকর্ম করেন মুক্ত জায়গায়। আধুনিক বিশ্বে একটি উন্নতশীল দেশে এ জিনিস ভাবা যায় না। এ ব্যাপারে ভারতের চেয়ে দরিদ্র দেশগুলির অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। শতাংশের নিরিখে মুক্ত পরিবেশে মলত্যাগ করা মানুষের সংখ্যা ভারতে ৪৮ শতাংশ। যেখানে আফগানিস্তানে ১৫ শতাংশ, কঙ্গোতে ৮ শতাংশ, বুরুন্ডিতে ৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশেও ৩ শতাংশ মাত্র মানুষ খোলা জায়গায় শৌচকর্ম সারেন। তথ্যটি কতটা বিপজ্জনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ খোলা জায়গায় মলমূত্র ক্রমশ মেশে ভূগর্ভস্থ জলে। যা থেকে ডায়েরিয়া ও এনসেফালাইটিসের মতো রোগের জন্ম হয়। এনসেফালাইটেসের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মারা যান ভারতে। সমীক্ষা এও বলছে, ডায়েরিয়া ভারতীয়দের এতটাই দুর্বল করে দেয় যে দরিদ্রতম রাষ্ট্রগুলিতে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষজনের সঙ্গে আমরা অনায়াসে পাল্লা দিতে পারি। যদিও তাদের থেকে অনেক বেশি ক্যালোরির খাদ্য গ্রহণে আমরা সক্ষম!

কিন্তু এর কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শৌচালয়ের অভাব অপুষ্টি-

আক্রান্ত শিশুর জন্ম দেয়। মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করলে তা জল ও খাদ্যকে দূষিত করে। যা থেকে ব্যাকটেরিয়া, আমাদের দেহের অগ্ন্যাশয়ে জীবাণুর জন্ম হয়। যার ফলে কোনো খাদ্য বস্তু থেকে সচরাচর যে পরিমাণ পুষ্টি আমাদের পাবার কথা, তার থেকে অনেক কম পুষ্টি পাই। ফলত অপুষ্টিতে ভোগাই আমাদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সিকিম ও কেরলের মতো রাজ্যে শৌচালয়ের সুযোগ গ্রহণ না করা মানুষের সংখ্যা বেশ কম। সিকিমে মাত্র ১৫.৯ শতাংশ এবং কেরলে ৬.৮ শতাংশ মানুষ শৌচাগার ব্যবহার করেন না। তাই এই দুই রাজ্যেই অপুষ্টির মাত্রা খুব কম। আবার বিহার ও ওড়িশায় উল্টো চিত্র। বিহারে শৌচাগার ব্যবহার করেন না এমন মানুষের সংখ্যা ৮২.৪ শতাংশ। ওড়িশায় এই শতাংশের হার ৮৫.৯। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই রাজ্যে অপুষ্টির মাত্রা অত্যন্ত বেশি। বিশেষজ্ঞরা এও বলছেন যে, শৌচালয় নির্মাণের চেয়ে খাবারের জন্য আমরা অন্তত ২৬০ গুণ বেশি ব্যয় করি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ভরতুকিযুক্ত খাবার-কর্মের জন্য আমরা ব্যয় করছি ২৬০ কোটি ডলার। কিন্তু জনগণের বার্ষিক ব্যয়ের নিরিখে শৌচাগার নির্মাণের জন্য আমরা খরচ করছি মাত্র ২০ কোটি ডলার।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিটাই পাল্টাতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু সুস্পষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৯ সালের মধ্যে প্রতিটি ভারতীয় যাতে শৌচালয় ব্যবহার করতে পারেন তার জন্যেই 'স্বচ্ছ ভারত' নামাঙ্কিত এই জন-আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি। একাজে তাঁরা তাঁদের 'মিশন'কে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। যার একদিকে রয়েছে গ্রাম-ভারতের জন্য স্বচ্ছ ভারত (গ্রামীণ) এবং দেশের ৪,০৪১টি শহরের জন্য স্বচ্ছ-ভারত (শহরাঞ্চল)। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের গ্রাম-শহরে অবস্থিত প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্যে দৈনিক ৬৬,৫৭৫টি বাড়িতে শৌচালয় তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সারা দেশ জুড়ে গ্রামীণ স্কুলগুলিতে ৫৬ হাজার ৯২৮টি শৌচালয় গড়তে পৃথক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ছেলে ও মেয়েদের আলাদা শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ থাকবে তাতে। আমাদের যত্র-তত্র শৌচকর্ম করার অভ্যাস পাল্টানোর জন্য সচেতনতা কর্মসূচিও গৃহীত হচ্ছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জাতীয় শৌচালয় নির্মাণ প্রচারের মধ্যে দিয়ে যার সূচনা হয়েছে। কোনো নতুন স্কুল, কলেজ, বাসস্ট্যান্ড, ডিসপেনসারি নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না, তাতে শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত না থাকলে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বৃহৎ ও মহৎ প্রকল্প দেশের ক্ষেত্রে কতটা উপকারী ও উপযোগী হতে চলেছে তা বুঝতে আরও একটি মারাত্মক তথ্যের দিকে নজর রাখা যাক। কেন্দ্রীয় পানীয়জল ও শৌচালয় মন্ত্রক প্রদত্ত এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড় ও উত্তরপ্রদেশে হদিশ না পাওয়া ও অকেজো শৌচালয়ের সংখ্যা শতাংশের হিসেবে যথাক্রমে ৯৫.৮২ শতাংশ, ৭২.০১ শতাংশ, ৬৯.৮২ শতাংশ, ৬৭.৮৯ শতাংশ, ৬৪.৬৮ শতাংশ ও ৬২.১৪ শতাংশ। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও জনসংখ্যাবিদ ডিয়ানে কফ্‌ফি এবং দিল্লী স্কুল অব্ ইকোনমিক্সের সুবিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ ডিন স্পিয়ারসের একটি লেখায় দেখা যাচ্ছে অর্ধেকের বেশি ভারতীয় মলত্যাগ করেন মুক্ত পরিবেশে। পাশাপাশি চীনে এক শতাংশেরও কম মানুষ, বাংলাদেশে চার শতাংশ এবং উপ-সাহারীয় আফ্রিকান দেশগুলির এক-চুতার্থাংশ মানুষ উন্মুক্ত পরিবেশে শৌচকর্ম সারেন। আজ উন্নতশীল ভারতবর্ষ যখন জ্ঞানে-বুদ্ধিতে চীন-সহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে তখন এহেন তথ্য যে দেশের পক্ষে মোটেই সুখকর হবে, তা শক্ত ও সমর্থ ভারত গড়তে উদ্যোগী মোদী সরকারের বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

তথ্য-পরিসংখ্যান-১

মোদীর এই জাতীয় আন্দোলন ২০১৯ সালের মধ্যে প্রতিটি ভারতবাসীকে শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(১) **দু'টি 'সাব-মিশন' :** গ্রামীণ ভারতের জন্য স্বচ্ছ ভারত (গ্রামীণ) এবং ৪,০৪১টি শহরের জন্য স্বচ্ছ ভারত (শহরাঞ্চল) যোজনা।

(২) আগামী পাঁচ বছরে দেশের সমস্ত গৃহে শৌচালয়ের বন্দোবস্ত করতে দৈনিক ৬৬ হাজার, ৫৭৫টি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা।

(৩) সারা ভারত জুড়ে গ্রামীণ স্কুলগুলির জন্য আরও ৫৬,৯২৮টি অতিরিক্ত শৌচালয় এবং এতে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকবে।

(৪) **আচরণ পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি :** বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জাতীয় শৌচালয় নির্মাণ আন্দোলন চলেছিল।

(৫) শৌচালয় ব্যতীত কোনো নতুন স্কুল, কলেজ, বাসস্ট্যান্ড এবং চিকিৎসালয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

তথ্য-পরিসংখ্যান-২

হদিশ না পাওয়া ও পরিত্যক্ত শৌচালয়ের হিসাব (শতাংশের বিচারে)

রাজ্য	শতাংশ
ওড়িশা	৮৫.৮২
ঝাড়খণ্ড	৭২.০১
মধ্যপ্রদেশ	৬৯.৮২
তেলেঙ্গানা	৬৭.৮৯
ছত্তিশগড়	৬৪.৬৮
উত্তরপ্রদেশ	৬২.১৪

সূত্র : কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও পরিচ্ছন্নতা মন্ত্রক

শ্রীমতী কফ্‌ফি ও স্পিয়ারসের নেতৃত্বাধীন একটি দল গত কয়েক বছর ধরে উত্তরভারতের ছ'টি রাজ্যে গ্রামীণ এলাকার মানুষের শৌচালয়ের চাহিদা ও এব্যাপারে তাঁদের মনোভাব খতিয়ে দেখতে সমীক্ষা চালান। সমীক্ষার ফলাফল বলা বাহুল্যই বেশ হতাশাজনক। এঁদের বক্তব্য যে অনেকে মনে করেন মুক্তস্থানে শৌচকর্মের মূল কারণ মূলত 'দারিদ্র্য' এবং 'শৌচালয় নির্মাণের অভাব'। এঁরা বলছেন প্রতি ক্যাপিটা ডিজিপি এবং মুক্তস্থানে শৌচকর্মের হারের সামান্য সম্পর্ক রয়েছে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির। এর পাশাপাশি সম্পদ ও শৌচালয় ব্যবহারেরও একটা সম্বন্ধ রয়েছে। কারণ শৌচালয় নির্মাণের খরচ এমন কিছু বেশি নয়। অথচ রোগ-ব্যাধি ঠেকাতে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। বাংলাদেশে এক সমীক্ষায় তাঁরা দেখেছেন, দু'-তিন হাজার টাকার মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় শৌচালয় নির্মাণ করা যাচ্ছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়।

জলের অভাবের জন্য ভারতবর্ষের মানুষ মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করছেন এই তথ্য ওই দুই গবেষক মানতে চাননি। হু (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ডব্লিউ এইচ ও) বলেছে গ্রামীণ ভারত 'উন্নতিশীল জলের উৎস'। পক্ষান্তরে বলা যায় উপ-সাহারীয় আফ্রিকায় অর্ধেকের কম মানুষ জলের উৎস সঠিকভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পান কিন্তু তার দ্বিগুণেরও বেশি মানুষ শৌচালয় ব্যবহার করেন। কফ্‌ফি ও স্পিয়ারসের গবেষণা এও বলছে যে, মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করার বিষয়টি উন্নতশীল বিশ্বের কাছে সমস্যা নয়। এই সমস্যা স্রেফ ভারতবর্ষের। কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যতিক্রম কেন? ব্যতিক্রম একটাই কারণে। এখানে জনসচেতনার অভাব এবং সেই অভাবের সৃষ্টির নেপথ্যে বিগত সরকারও দায় এড়াতে পারে না। ওই দুই গবেষক এই প্রেক্ষিতে যে প্রতিবেদন পেশ করেছেন তা এস কিউ ইউ এ টি 'রিপোর্ট' নামে প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। যে রাজ্যগুলিতে তাঁরা সমীক্ষা চালান তার মধ্যে রয়েছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহারের মতো রাজ্য।

ইউপিএ-২ সরকার তাদের নির্মল ভারত অভিযানে প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের জন্য ১০ হাজার টাকা ধার্য করেছিল। যা এখন বৃদ্ধি পেয়ে ১২ হাজার টাকা হয়েছে। কিন্তু শৌচালয় নির্মাণ পরিকল্পনা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে ১.০৪ কোটি গ্রামীণ বাড়িতে এবং আড়াই লক্ষ বিশেষ শৌচালয় নির্মিত হতে চলেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন এই প্রকল্পে খরচ বিগত সরকারের আমলের চেয়ে বহুগুণ হতে পারে না। বাংলাদেশের জিডিপি ২৪৭৫.৯৭ ডলার, অন্যদিকে ভারতের ৫২৩৮.০২ ডলার, অর্থাৎ বাংলাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি। কিন্তু স্পিয়ারস ও কফ্‌ফির সমীক্ষা বলছে, 'বাংলাদেশে প্রায় কেউই মুক্তস্থানে শৌচকর্ম সারেন না।' ১৯৬৪ সালে উইস্টন চার্চিলকে ভি এস নইপল লিখেছিলেন : ''ভারতীয়রা সমুদ্রতটে মলত্যাগ করে, তারা পাহাড়ে মলত্যাগ করে, তারা রাস্তায় মলত্যাগ করে। আবৃত জায়গায় শৌচকর্ম করার কথা তারা ভাবতেই পারে না।'' এরপর সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পার করেও কোনো

তথ্য-পরিসংখ্যান-৩

কয়েকটি লজ্জাজনক তথ্য ও পরিসংখ্যান

(১) দেশের ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ বাড়িতে কোনো শৌচালয় নেই।

(২) দেশের ৭৮ শতাংশ আবর্জনা নদীতে পড়ে।

(৩) প্রতিদিন ৬০০০ টন প্লাস্টিক-বর্জ্য আবর্জনা উৎপাদিত হয়ে অসংগৃহীত অবস্থায় পড়ে থাকছে রাজপথে।

(৪) দেশের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম সারেন। আমাদের চেয়ে অনেক দরিদ্র দেশের অবস্থা এর থেকে উন্নত। যেমন ভারতে শতাংশের বিচারে ৪৮ শতাংশ মানুষ খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। আমাদের থেকে দরিদ্রতর বিভিন্ন দেশ যেমন আফগানিস্তান, কঙ্গো, বুরান্ডি ও বাংলাদেশে শতাংশের বিচারে যথাক্রমে ১৫,৮,৩ ও ৩ শতাংশ।

সরকার এ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিল না কেন তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ী সরকার প্রথম এনিয়ে সদর্থক উদ্যোগ নেয় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর যাঁরা সিংহভাগ সময় দেশের সিংহাসনে আসীন রইলেন, বিশেষ করে নইপল যখন ওই চিঠি লেখেন তার পূর্বে সতেরো বছরই তো স্রেফ নেহরু যুগ, তাহলে দেশের এই অসম্মানের দায় তাঁরাও এড়াতে পারেন না। আজও ৫৯.৭০ কোটি ভারতীয়ের শৌচালয়-গৃহের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই একথা ভাবা যায় না।

আর এর ফলে ভারতের অর্থনীতি, সমাজ এবং স্বাস্থ্যও একপ্রকার বিপন্ন হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের জল ও শৌচালয় প্রকল্পের হিসেবে

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন যোগগুরু বাবা রামদেব।

নির্মলীকরণের জন্য এক ডলার খরচ হলে তা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে অন্তত নয় ডলার বাঁচিয়ে দেয়। তাছাড়া মুক্তস্থানে শৌচকর্ম করার জন্য শিশুদের ডায়েরিয়া, অপুষ্টি এবং তাদের শারীরিক গঠনে নানা খুঁত ধরা পড়ে। এই শৌচালয় নির্মাণের মূল খরচ বহন করছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যগুলির ওপর এ ব্যাপারে কোনো চাপ বাড়ছে না। এক একটা শৌচালয়ের পেছনে হাজার বারো টাকা করে খরচা হলে ওই বিপুল সংখ্যক শৌচাগারের জন্য দেশের গ্রামীণ এলাকায় আগামী পাঁচ বছরে আনুমানিক ১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে ধারণা। এর মধ্যে ৭৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে কেন্দ্র। বাকি ২৫ হাজার কোটির ব্যয়ভার নিতে হবে রাজ্যকেই। যদিও শহরাঞ্চলে যে শৌচাগারগুলি নির্মিত হবে সেক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপারে রাজ্যকেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরে খরচের সম্ভাবনা প্রায় ৬২ হাজার কোটি টাকা। পিপিপি (প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ) মডেলের মাধ্যমে এহেন বিপুল খরচের একটা বড় অংশই বহন করবে রাজ্য।

অর্থ যাতে সঠিক খাতে খরচ হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে মোদী সরকার। কারণ ১৯৯৯ সালে প্রথম যখন গ্রামীণ শৌচালয়ের জন্য সরকার তহবিল চালু করল তখন বলা হয়েছিল ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ শৌচালয় নির্মিত হবে। কিন্তু ২০১২-এ কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় দেখা যায় এর মধ্যে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪ হাজার শৌচাগারের কোনো অস্তিত্বই নেই। সঙ্গে ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৫ হাজার শৌচালয় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার তুলনায় অনেক কম শৌচাগার নির্মিত হয়েছে বলে দেখা যায়। মোট লক্ষ্যমাত্রার তেতাল্লিশ শতাংশ শৌচাগারেরই হয় কোনো হদিশ নেই, না হয় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণের যে লক্ষ্য কেন্দ্র স্থির করেছিল তার মধ্যে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৯ হাজারেরই অস্তিত্ব হয় নেই, নয় পরিত্যক্ত। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, ২০০৪ সাল পর্যন্ত শৌচালয় নির্মাণের কাজ খুব ভালোভাবেই এগিয়ে ছিল। কিন্তু তার পরবর্তী দশকে দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জমান সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। গত ২৫ আগস্ট রাজ্য-মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি মেনে নেন যে বেশ কিছু শৌচাগার বর্তমানে গুদাম ঘরে পর্যবসিত হয়েছে। বিগত এনডিএ জমানায় নির্মিত শৌচালয়ও গত এক দশকের ইউ পি এ রাজত্বে এভাবেই গুদাম ঘরে পরিণত হয়েছে।

তবে মোদীর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযানে' কেবল শৌচালয় নির্মাণ-ই একমাত্র অ্যাজেন্ডা নয়। এ ব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র জল ও পরিবেশ দূষণ। সমীক্ষা বলছে যে শহরাঞ্চল ভারতবর্ষে বছরে ৬.৮৮ কোটি টন বর্জ্যপদার্থ উৎপাদিত হয়। এর ওপরে ৬ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য পদার্থ ও অসংগৃহীত অবস্থায় প্রতিদিন পড়ে থাকছে। অজৈব বর্জ্যও উৎপন্ন হচ্ছে পাহাড়ি এলাকায়। সমীক্ষায় এও জানা যাচ্ছে, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে দিল্লীর ১,৪০০ বর্গকিলোমিটার জমি লাগবে স্রেফ রাজধানীর বর্জ্য জমা রাখতে। ৭৮ শতাংশ আবর্জনা পড়ছে নদীতে। ফলে জল দূষণও চরম মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে। যার ফলে ভূ-গর্ভস্থও জলও মারাত্মক দূষণের কবলে পড়ছে।

মোদীর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' সফল হবে কি না তা সময়ই বলবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য শক্ত ও সমৃদ্ধ ভারত গড়তে এই অপরিহার্য বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করছে না কেন্দ্র। উপরোক্ত তথ্য-পরিসংখ্যানাদিই প্রমাণ করছে কাজটি কতটা জটিল। আর এই জটিলতম কাজে উদ্যোগী হবার যে সৎ ও ব্যতিক্রমী সাহস দেখিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

(তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়া টু ডে)

নালন্দার পুনর্জন্ম

পঞ্চম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বর্বর মুসলমান হানাদার বখতিয়ার খিলজির সেনা ১১৯৩ খৃস্টাব্দে লুঠপাট, ভাঙচুর এবং অগ্নি সংযোগ করে ধ্বংস করেছিল। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন হিউয়েন সাঙ। এই বর্বরোচিত ঘটনার ৮২১ বৎসর পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪-তে পুনরায় পঠন-পাঠন আরম্ভ হওয়া বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘটনা বলে মনে করি। কথিত আছে বখতিয়ারের ভৈরববাহিনী লুঠপাট এবং ইমারতগুলি ধ্বংসের পর বিশাল গ্রন্থাগারের মধ্যে তাদের কোনো ধর্মগ্রন্থ 'আসমানি কিতাব' আছে কিনা তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন নিঃসন্দেহ হয়, যে এক কপিও ইসলাম ধর্মের গ্রন্থ নেই তখন তারা গ্রন্থগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রায় তিনমাস ধরে গ্রন্থগুলি তুষের আগুনের মতো ধিক ধিক করে জ্বলেছিল। এখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য—

'তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত, সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে। যে কোনো পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে। যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। যে কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে, প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম। [Practical Vedanta, স্বামী বিবেকানন্দ।]

এখানে উল্লেখ্য যে মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশ্বাস— তাদের ধর্মগ্রন্থ কখনো আগুনে দগ্ধ হতে পারে না, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্ট পর্যন্ত লাকসাম রেলজংশন হয়ে যেসব যাত্রী চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি গিয়েছেন, তারা দেখেছেন এক মুসলমান যুবক ট্রেন যাত্রীদের নিকট রবিনসন বার্লির একটা বড় কৌটোর উপরে ফুটো করে

চিঠিপত্র

মুসলিম লীগের চাঁদা সংগ্রহ করতো। তার বক্তব্য ছিল সে পূর্বে হিন্দু ছিল। একদিন গ্রামের পথে চলার সময় দেখতে পেল এক বাড়িতে আগুন ধরেছে এবং দাউ দাউ করে ঘরগুলি জ্বলছে। এরই মধ্যে একটি পুস্তক পাখির মতো আকাশে উড়ে গিয়ে একটি তালগাছের উপর আশ্রয় নিয়েছে। তখন লোকেরা তালগাছ থেকে নামিয়ে দেখে সেটা একটা কোরাণ শরিফ। তখন তার বিশ্বাস হয় ইসলামের উপর এবং কাফেরের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম কবুল করে আল্লাপাকের রাজত্ব কায়েম করার জন্য মুসলিম লীগে যোগ দেয়। তার কথা শুনে অনেক মুসলমান টুপটাপ করে ওই কৌটায় চাঁদা দিত। এই পত্রলেখক ঢাকা থেকে তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালি যাওয়ার পথে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

ইতিমধ্যে আল কায়েদা হুমকি দিয়েছে ভারতকে উল ইসলামে পরিণত করার জন্য এবং মহান ইসলামের সুশীতল ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার জন্য ভারতে তার শাখা খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমান যুবকদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়াও মিলেছে ওই বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য। যদি তারা শাখা খোলে তবে সর্বাগ্রে আক্রান্ত হবে বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি। তাই তাদের উচিত কিছু ইসলামি কিতাব গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা, যাতে অগ্নিসংযোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়!

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

তৃণমূল-সিপিএমের বন্ধুত্ব

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেছিলেন, সিপিএম বিষধর সাপ সুতরাং বিষধর সাপের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেন সিপিএমের সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করবেন। তাদের সঙ্গে কোনোপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন না। তাঁদের নেত্রী দিদি সারা রাজনৈতিক জীবনে সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। তাঁর একটাই লক্ষ্য ছিল সিপিএমের তথা বামপন্থীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করা। ক্ষমতা দখলের পর এমন কী পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে নবান্নে ডেকে খাতির করে চপ কাটলেট খাওয়ালেন এবং বললেন আপনাদের সংগঠনকে মজবুত করুন, যেন আপনাদের দল থেকে লোক অন্য দলে না যায়। আবার এও বলেছেন সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা করতে আপত্তি নেই, যদি ওরা এগিয়ে আসে, কেউই অচ্ছুত নয়। এ এক তাজ্জব ব্যাপার তাই নয় কি? কিন্তু আমি এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

তখন দিদির একটাই লক্ষ্য ছিল সিপিএমকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করা, কেননা বাংলাকে চৌত্রিশ বছরে সিপিএম শেষ করে দিয়েছে। এখন সে উদ্দেশ্য মোটামুটি সফল, গত লোকসভা নির্বাচনে প্রায় শূন্য হয়ে যাচ্ছিল, কোনোরকমে কংগ্রেসকে পরাজিত করে দু'টি আসন পায়। কেননা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং সিপিএম শেষ হয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কমপক্ষে দশ/পনেরো বছর একমেবাদ্বিতীয়ম ভাবে রাজত্ব করে যাবে। আর বিজেপি দিল্লিতে থাকলেও আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হবে, মাথায় উঠতে পারবে না। সুতরাং তৃণমূল ৩৪/৩৬টা আসন পেলে তাঁদের কথা অনুসারে চলবে, ট্যাঁ-ফু করতে পারবে না। যখন নির্বাচন প্রচারে তিনি দেখলেন মোদী ঝড় তখন মোদীজীর বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলা শুরু করলেন। যখন দেখলেন বিজেপি একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে এবং তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেছে তখন মরিয়া হয়ে উঠলেন। এখন দেখছেন মোদীজী স্বাভাবিকভাবেই তাকে পাত্তা দিচ্ছেন না এবং সারদা নিয়ে নাকানি-চোবানি করতে পারে তখন তাঁকে প্রধান শত্রু হিসাবে ধরে নিয়েছেন। সুতরাং শত্রুর শত্রুকে মিত্র করার সূত্রানুযায়ী সিপিএমকে মিত্র হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাই বিজেপি-র উপর এত অত্যাচার, এত রাগ। কে জানে বিজেপি তাঁর

রাজত্বে হয়তো প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাস্তবে কিন্তু তাই হতে চলেছে। তাই সিপিএমের সঙ্গে এত হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব করার এত চেষ্টা, কিন্তু দিদি বৃথা চেষ্টা!

—**কমল মুখোপাধ্যায়,**
চন্দননগর, হুগলী।

বসিরহাটে পদ্মফুল

১৯৯৮ সালের পর ২০১৪। ১৯৮০ সালে বিজেপি আত্মপ্রকাশ করার পর '৯৮ সালে তৃণমূল-বিজেপি জোটের বিজেপি প্রার্থী বাদল ভট্টাচার্য এক উপনির্বাচনে বিধায়ক নির্বাচিত হন হাবড়া (উত্তর ২৪ পরগনা) কেন্দ্র থেকে। অতঃপর ২০১৪ সালে একক শক্তিতে বিজেপি-র আর এক 'ভট্টাচার্য' প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য আবার এক উপনির্বাচনে জয়ী হলেন বসিরহাট দক্ষিণ (উত্তর ২৪ পরগনা) কেন্দ্র থেকে। বাদলবাবু বিধানসভায় ঢুকেছিলেন বাম রাজত্বে। আর শমীকবাবু ঢুকলেন তৃণমূল রাজত্বে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিজেপি প্রার্থী লোকসভার তুলনায় এত কম মার্জিনে জিতলেন কেন? কারণ বহুবিধ। প্রথমত, বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রটি গ্রামীণ ও শহর— এই দু'ভাগে বিভক্ত। গ্রামীণ এলাকা মুসলমান এবং শহর এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত। মুসলমান মৌলবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে মুসলমান তোষণকারী তৃণমূলের যোগ। কেন্দ্রটি সীমান্তবর্তী হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, গোরু পাচারের সঙ্গে নারী পাচার, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-নারী ধর্ষণ ইত্যাদি এখানকার নিত্যকার ঘটনা। এই সব ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের নেতা- কর্মীরাই মূলত যুক্ত ও হিন্দুরাই হচ্ছে সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত এবং তৃণমূলের রাজত্বে ঘটা ও মুসলমান তৃণমূল নেতা-এমপিদের দ্বারা ঘটানো দেগঙ্গা, নলিয়াখালি, ক্যানিং, কামদুনির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনাগুলিতেও মূলত হিন্দুরাই হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে অধিকাংশ হিন্দু ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত এবং নিজেদের মনে করছে বিপন্ন। স্বভাবতই তারা তৃণমূলের উপর ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ এবং মুসলমান তোষণকারী (পড়ুন সেকুলারবাদী) অন্যান্য দল ও তৃণমূলকে একাসনে বসিয়ে বিজেপিকেই নিজেদের ত্রাতা বা রাজনৈতিক বন্ধুরূপে বেছে নিয়েছে। আর এই কারণেই ঘটে গেছে ভোটে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ নীরবে। বিজেপি-কে ভোট দিয়েছে এরাই। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল এই কেন্দ্রটিকে করেছিল প্রেস্টিজ ইস্যু। অ-তৃণমূলী হিন্দুদের দেওয়া হয়েছে হুমকি, ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, কেড়ে নেওয়া হয়েছে অনেকের ভোটার কার্ড, অতঃপর টাকার খেলা তো ছিলই। তাছাড়া ভোট-ডাকাতির ছিল এলাহি ব্যবস্থা। কিন্তু নির্বাচন কমিশন (দিল্লী)-র কড়া নজরদারি ও আধাসামরিক বাহিনীর বজ্র আঁটুনিতে মুকুলের আশার মুকুল গেছে ঝরে, ভেস্তে গেছে সব প্ল্যান। তাই তৃণমূলের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ভোটে শেষ হাসিটি হেসেছে পদ্ম-বিজেপি। শমীকও হেসেছেন।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

নারী সমাজ ও শিক্ষা

২৫ শ্রাবণ ১৪২১ সংখ্যায় শুভশ্রী দাসের 'অঙ্গনা' বিভাগে লেখাটা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই, খুব ভাল লেগেছে। তাঁর লেখা যুক্তিযুক্ত হলেও একটুখানি ফাঁক রয়ে গিয়েছে বলে আমি মনে করি। তার কথা ধরেই বলছি--- তিনি লিখেছেন 'শিক্ষাই পারে নারী সমাজকে শক্তিশালী করতে'। সর্বক্ষেত্রে কী সেটা প্রযোজ্য? শিক্ষা পারে প্রজ্ঞার আলোকে নারীর চৈতন্য ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু শক্তিশালী করতে পারে একথা ভুল। যত শিক্ষিতই হোন না, একক নারী বিপদের সম্মুখীন হলে, তাঁর কিছুই করার থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিতা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষয়িত্রী স্বয়ংসম্পূর্ণা হয়েও শিকারির কামার্ত চোখ এড়িয়ে যেতে পারেননি। লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে তাকেও। একটা বিষয় আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয়ে প্রথাগত বিদ্যার সঙ্গে যদি জুডো বা ক্যারাটের মতো আত্মরক্ষামূলক শরীর-শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহলে মেয়েরা অবশ্যই সক্ষম হবেন সন্ত্রাসী শক্তির সঙ্গে লড়াই করে আত্মসম্মান রক্ষায় মোকাবিলা করতে।

উপরোক্ত লেখিকার একটা বিশেষ বক্তব্যে আমি তাঁর সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বালকদের তুলনায় বালিকাদের স্কুলছুটের হার বেশি। তাঁর মতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অনেক খামতি আছে। প্রাথমিক স্তরে বালিকাদের স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যাও খুব কম থাকে। উপস্থিত হলেও মিড- ডে-মিল হবার পর পরই তারা বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হয়। এর কারণ একটাই, বালিকাদের জন্য অনুকূল স্থিতি নির্মাণের কোনো ভাবনা নেই। শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রেও ওই একই কারণ। ফলে শিক্ষিকার সংখ্যা প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় খুব কম। বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার না থাকায় বিপরীত প্রভাব পড়ছে।

—**বেলা দে,**
সামসী, মালদহ।

পরশুরাম

অবতার শক্তির দম্ভনাশ

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। কবি জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে তাঁকে এইভাবে দেখতে পাই—

"ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে।।"

ইনি ক্ষত্রিয় রুধির রূপ জলে জগতকে স্নান করিয়ে তার পাপ ধৌত করেন এবং সংসারের তাপ শান্ত করেন। পরশুরামের কীর্তিকলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেই সময়ে সমাজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার মেলবন্ধ ঘটানো। এই মেলবন্ধনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়েছিল, যার অব্যবহিত ফল স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব। যাই হোক, পরশুরামের কার্যকলাপ ভারতীয় জাতীয়তাবাদে কেমন প্রভাব ফেলেছিল সেকথা আলোচনা করতেই হয়। কিন্তু সর্বাগ্রে আলোচনা করতে হয় তাঁর চরিতকথা, যা পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে বিদ্বান ঋষি ঋচীকের বিবাহ হয়। মহারাজ গাধি এবং জামাতা ঋচীক উভয়েই পুত্রহীন ছিলেন। ঋচীক পুত্রলাভের আশায় ব্রহ্মশক্তির সহায়তার ক্ষীর তৈরি করে পত্নী সত্যবতীকে খেতে দিলে তিনি তাঁর মায়ের জন্য ক্ষীর প্রার্থনা করেন। ঋষি ঋচীক ক্ষাত্রবীর্য সংগ্রহ করে ক্ষীর প্রস্তুত করে তার মায়ের জন্য দিয়ে কার্যব্যপদেশে অন্যত্র গমন করেন। ঋচীক প্রথম ক্ষীরটি পত্নী সত্যবতীকে এবং দ্বিতীয়টি তাঁর মাতাকে খেতে বলেন। সত্যবতী মাতাকে সব কথা বললে, মাতা ভাবলেন সকলেই তো চায় নিজের পুত্র গুণবান হোক; তাহলে নিশ্চয় প্রথম ক্ষীরটির মধ্যেই সর্বগুণবান পুত্র লুকিয়ে আছে। তিনি সত্যবতীর ক্ষীর খেলেন আর সত্যবতী তাঁর মাতার ক্ষীর খেলেন। এই প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের কী দুর্দশা হলো দেখুন। ঋচীক ফিরে এসে পত্নীর মুখে ক্রূরতার ছাপ দেখে বুঝলেন ক্ষীর খেতে গণ্ডগোল হয়েছে। তিনি বললেন,— 'এই গণ্ডগোলের জন্য তোমার ছেলে ক্রূরকর্মা ক্ষত্রিয় হবে, আর তোমার ভাই ব্রাহ্মণের গুণ প্রাপ্ত হবে।' সত্যবতী ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, 'আমার পুত্র যেন ক্ষাত্রগুণ না পায়, আমার পৌত্র ক্ষাত্রগুণ লাভ করুক।' ঋচীক সেই আশীর্বাদ করলে সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ হয়েও তপস্বীর জীবন-যাপন করতে লাগলেন আর তাঁর পুত্র পরশুরাম পেলেন ক্রূরকর্মা ক্ষত্রিয়দের সকল গুণ। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, শাস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, ও পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। তিনি সবচেয়ে কাঁধে একটি কুঠার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাই তাঁর নাম হলো পরশু (কুঠার) রাম।

জমদগ্নি ছিলেন ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন। তিনি নর্মদা তীরে সপরিবারে আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস করতেন। জমদগ্নি মুনির আশ্রম থেকে কিছুদূরে বিখ্যাত হৈহয় বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল। সেখানে সহস্রার্জুন নামে এক রাজা তখন রাজত্ব করতেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন রাজার অন্যতম এই সহস্রার্জুন। বাকি চারজন হলেন— পৃথু, ভরত, নল, রামচন্দ্র। সহস্রার্জুন অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয়ের ভক্ত ছিলেন। দত্তাত্রেয় তাঁকে দু'টি বর দান করেন— (১) যুদ্ধের সময় তার সহস্র বাহু হবে, (২) তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু হবে। ওই সহস্র বাহু আসলে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীবৃন্দ, তিনি কঠোর পরিশ্রম করে বিশ্বস্ত অনুগামীদের তৈরি করেছিলেন। আপন অনুগামীদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি এক অভেদ্য সংগঠন তৈরি করেন, সংগঠন গড়ার এই বিদ্যা তিনি দত্তাত্রেয়ের থেকে অর্জন করেন। এমন অতুলনীয় বুদ্ধি সামর্থ্য ও সংগঠন কুশলতা তিনি রপ্ত করেছিলেন যে, লোকের আদর্শ স্থানীয় হয়ে ওঠেন। এমন সমর্থ পুরুষের প্রচণ্ড সাহস ও অহঙ্কার থাকা স্বাভাবিক। তার প্রার্থিত দ্বিতীয় বরটির মধ্যে এই অহঙ্কার লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এমন সংগঠকেরও ত্রুটি ছিল। তিনি এই ভয়ে সর্বদা ভীত ছিলেন যে, এমন সংগঠন যদি কেউ গড়ে ফেলে। তাই তিনি অনুগামীদের নানাকাজে, বিশেষত রাজ্যজয়ের কাজে লিপ্ত রাখতেন। ফলে তাঁর সংগঠন স্বার্থচিন্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদী, লুণ্ঠনকারীর সংগঠন হয়ে গেল; জনগণ থেকে দূরে সরে গেল।

জমদগ্নির আশ্রম সহস্রার্জুনের রাজধানীর নিকটেই ছিল। জমদগ্নির কাছ থেকে পুত্র পরশুরাম তেজস্বিতা ও অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। তিনি রাজা থাকাতে সকল লোককে রক্ষার দায়িত্ব তাঁর; সুতরাং তাঁর এলাকায় অন্য কেউ যেন শস্ত্র ধারণ না করে; করলে তাঁর প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। পরশুরাম একথা কেন শুনবেন?

তিনি সর্বদা একটি কুঠার তাঁর কাঁধে রাখতেন। তাঁর দেখাদেখি অনেকেই কুঠার নিয়ে ঘুরতে লাগল। সহস্রার্জুনের বিরোধে দাঁড়ানোর ফলে অন্যেরা তাঁকে সাহসী মনে করে তাঁর অনুগামী হয়ে উঠল। সহস্রার্জুন তাঁর অনুগামীদের মুখে সব শুনলেন; তবুও বিবাদে লিপ্ত হলেন না। কিন্তু পরশুরামের ঔদ্ধত্যও তাঁর অসহ্য হলো। অবশেষে পরশুরামের সঙ্গে বিরোধ করার জন্যই অনুগামীদের দিয়ে জমদগ্নি মুনির হোমধেনুর বাছুর চুরি করালেন। আশ্রমবাসীরা রাজার কাছে নালিশ করলে সহস্রার্জুন বিরক্ত হয়ে বললেন পরশুরাম থাকতে আমাকে বলছেন কেন? পরশুরাম সব শুনে সহস্রার্জুনের রাজ্য আক্রমণ করলেন। এবং অনুগামী সহ সহস্রার্জুনকে বধ করলেন। তারপর চলে গেলেন তীর্থ পর্যটনে। সুযোগ বুঝে সহস্রার্জুনের পুত্র পরশুরামের আশ্রম আক্রমণ করে পিতা জমদগ্নিকে হত্যা করলেন। তীর্থ থেকে ফিরে পরশুরাম মায়ের মুখে সব শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন; জগতের সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শোণিতে পিতৃতর্পণ করবেন। করলেনও তাই। এই পৌরাণিক কাহিনির রূপকটুকু ছেড়ে দিলে দেখি, পরশুরাম সহস্রার্জুনের প্রতাপ ও তেজের রহস্য পূর্বেই জেনেছিলেন। সেজন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ কল্পে তিনি এক নবীন সংগঠন তৈরি করেন। স্বার্থপর সংগঠন ও পরার্থপর সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। পরশুরাম এই পরার্থপর সংগঠনের সাহায্যে স্বার্থপর সংগঠনের নেতা সহস্রার্জুনকে হত্যা করলেন। নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ লোকের হাতে নিহত হওয়ার জন্য সহস্রার্জুনের বাসনাও পূর্ণ করলেন।

পরশুরাম সহস্রার্জুনকে বধ করার পর আবার তীর্থযাত্রায় মন দিলেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা কি করবে? তারা সহস্রার্জুনের বিশাল সাম্রাজ্য লুঠপাট করতে লাগল। একদিন কিছু লোক পরশুরামের কাছে তার অনুগামীদের কুকীর্তির কথা প্রকাশ করলে তিনি তাঁর অনুগামীদের ধ্বংস করলেন। এই ধরনের কাজ তাঁকে বেশ কয়েকবার করতে হয়। পুরাণকার তাকেই পরশুরাম কর্তৃক একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার কথা বলেছেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় শক্তির দম্ভনাশ করেছিলেন। তবে ক্ষত্রিয়দের সংহার না করে নিয়ন্ত্রণ করলে ভালো হোত। সমাজের কল্যাণের জন্য চর্তুবর্ণের প্রয়োজন— ক্ষত্রিয়েরও অবশ্য প্রয়োজন। সমাজে ক্ষত্রিয়দের রক্ষা করা বিচারশীল বুদ্ধিমান নেতৃত্বের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানে সচেতন না হয়ে ব্যক্তিগত অপমানে দীর্ণ পরশুরাম কেন যে এই ক্ষত্রিয় সংহারের কাজটি অত্যুৎসাহে করতে লাগলেন তা সহজে বোঝা যায় না। তিনি অবতারপুরুষ। তিনি হয়তো এমন কিছু ক্ষতির অশনি সংকেত পেয়েছিলেন যা দেশকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করতো। তাই তিনি দেশকে রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেন। আর ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি তাঁর বিজিত সমস্ত রাজ্য মহর্ষি কশ্যপকে দান করে দাক্ষিণাত্যেও চলে যান। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। কশ্যপ অরাজক ভারতবর্ষকে সুশাসন দিয়ে সুগঠিত করেন। পরশুরাম অবতারের প্রধান কর্তব্য পরার্থপর সংগঠনের সাহায্যে স্বার্থপর সংগঠন ধ্বংস করা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আজও এই আদর্শের একান্ত প্রয়োজন। তবে যদি দলবাজি রোধ করা যায়। ■

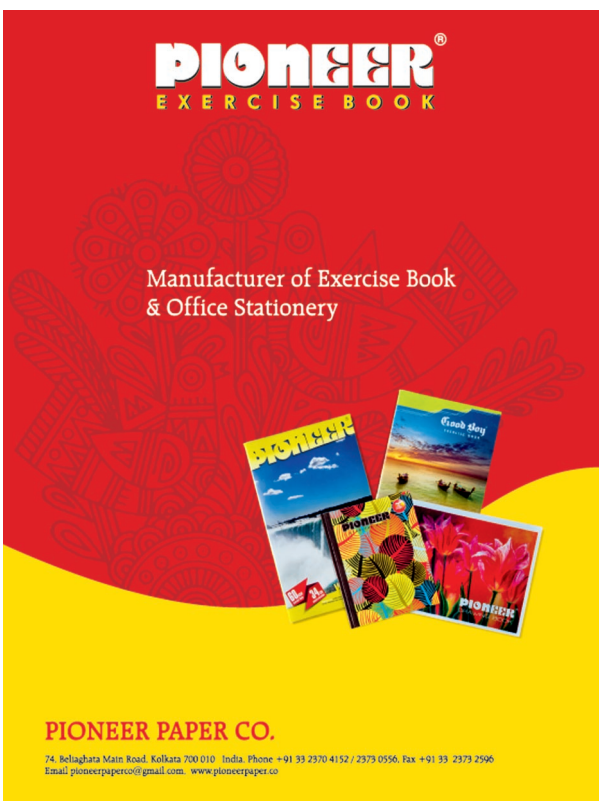

নেত্রদান মহাদান

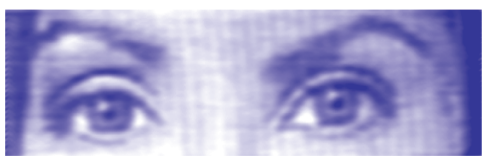

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

হিন্দু শাস্ত্রে পরিবেশ বিজ্ঞান

পরম্পরা

রবীন সেনগুপ্ত

সারা বিশ্ব জুড়ে নানা দেশেই এখন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে স্কুল কলেজে পড়ানো হচ্ছে, পণ্ডিতরা গবেষণা করছেন। যদিও এতে কাজের কাজ খুব একটা হচ্ছে না। পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে কোটি কোটি ডলার অর্থ ব্যয় করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তা উন্নত দেশগুলিই আগে অমান্য করছে।

প্রাচীন যুগে কিন্তু এরকম ছিল না। সে যুগের হিন্দু মুনি ঋষিরা শাস্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশ নিয়ে এত সুন্দর ভাবধারা প্রদান করে গেছেন যে বিপুল অর্থব্যয়, বাক্য ব্যয় ও গবেষণা ব্যয় ছাড়াই হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পরিবেশ— দূষণ মুক্তই ছিল প্রায়। শাস্ত্রগুলিতে ঋষিদের যে মেধার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তাঁরা হয়ত আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক কিছুই আবিষ্কার করে যেতে পারতেন। কিন্তু এগুলি ব্যবহারের ফলে প্রকৃতি তথা পরিবেশ বিপন্ন হবে, বিপন্ন হবে গাছ, প্রাণী ও মনুষ্যকুল— এই ভেবেই হয়তো তারা সীমিত আবিষ্কারের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রগুলির নানা স্থানে পরিবেশকে প্রকৃতিমাতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ধরণীমাতা বা মা বসুন্ধরা নামে। এইরকম কনসেপ্ট ইসলাম বা খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নেই। শুধু এই দু'টি ক্ষেত্রকেই মাতা বলে তারা অভিহিত করে তাদের ভাবনা-চিন্তা শেষ করে দেননি। প্রতিটি প্রাকৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ জড় উপাদানগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা প্রদান করে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীদের জন্য মন্ত্র ও স্তোত্র রচনা করে গেছেন। গঙ্গামাতা, গো মাতা, পবনদেব, বরুণদেব, অগ্নিদেব, চন্দ্রদেব, সূর্যদেব ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথাও আছে নানা পুরাণে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যেও ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি রয়েছে। তাদের তোমরা সামান্য কারণে হত্যা করো না। একথা বললে চট করে কোনো সাধারণ মানুষ কথাটা মান্য করবে না। তাই হিন্দু শাস্ত্রকাররা তুলসী পুজো, গো-পুজো, বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের পুজোও প্রচলন করে গেছেন। বিভিন্ন দেব-দেবীর বাহন হিসাবে সিংহ, বাঘ, গাভী, ষাঁড়, পেঁচা, ইঁদুর, সাপ, ময়ূর ইত্যাদিকে রাখাটাও একই পরিকল্পনার অঙ্গ। কিন্তু আমাদের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে এবং পত্র-পত্রিকাগুলিতে তা বলা হয় না। সেখানে বলা হয় যে আদিম মানুষ কিছু জানতো না। তাই তারা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে দেব-দেবী হিসাবে কল্পনা করেছিল। জ্ঞানী ঋষিদের পরিবেশ সুরক্ষার পরিকল্পনার বিষয়টি এইসব মানবতাবাদী ও সেকুলারি গ্রন্থ-প্রণেতারা বুঝতেই পারেননি।

প্রকৃতির বিভিন্ন অংশকে হিন্দুরা আপনার আত্মীয় মনে করে আজও। তাই চাঁদমামা, সূর্যমামা নামে ডাকা হয় এদের। ইসলামে তো বলা হয়েছে যারা প্রকৃতির নানা পদার্থকে পুজো করে তারা অংশীবাদী। অতএব তারা কাফের এবং বধযোগ্য। এই শিক্ষার জন্যই মুসলমান দেশগুলির অধিকাংশই দিন দিন আরো মরুময় দুঃসহ আবহাওয়ার কবলে পতিত হচ্ছে। এই শিক্ষার জন্যই তাদের গো-হত্যা করতে একটুও দ্বিধা হচ্ছে না।

মনু-সংহিতা নামের বিখ্যাত শাস্ত্র গ্রন্থে অপরিণত গাছ কাটলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে শাস্তিপ্রদান করার নির্দেশ দেওয়া আছে। শিব পুরাণ শাস্ত্রে বৃক্ষরোপণ ও জলাশয় নির্মাণ করাকে মহাপুণ্যের কাজ রূপে উল্লেখ করা আছে। মঠ মন্দিরে পঞ্চবটী বন নির্মাণ, উদ্যান ও কূপ নির্মাণের নির্দেশও আছে শাস্ত্রে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম ব্রাহ্মণ অংশে ১২৫তম শ্লোক থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত নানা শ্লোক অত্যন্ত উচ্চমানের সংস্কৃত ভাষার দ্বারা ঋষিরা তুলে ধরেছেন। এসব শ্লোক পাঠ করলে পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে একটা আধ্যাত্মিক চেতনা গড়ে ওঠে। এসব শ্লোক চেপে গিয়ে আধুনিক সেকুলারবাদী লেখকরা লেখেন যে পরিবেশ চেতনা আগে ছিল না। ইউরোপীয়ানরা প্রথম মাত্র শ' খানেক বছর পূর্বে এই বিষয়ে চেতনা প্রদান করেছিল। কত বড় মিথ্যা তথ্য এসব। আমরা অবশ্য ঋষিদের মন্ত্রের সুরে বলব— মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষ বীভূঃ স্বাহা...।। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

হাতে খড়ি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘মাসি, তুমি তো চমৎকার ছবি আঁকতে জান? কার কাছে শিখেছিলে আঁকতে, নন্দদার কাছে, না মুকুলদের কাছে, অসিতবাবুর কাছে, না দেবীবাবুর কাছে?’

‘অবু, আমার আঁকা ছবি তুমি দেখলে কোথায়?’

‘যদি না ধমকাও তো বলি।’

‘বলে ফেল, ধমকাব না।’

‘চাংড়াদিদি দেখিয়েছে ঠাকুরঘরে কুলুঙ্গিতে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে তোলা ছিল লাল সুতোয় বাঁধা সোনার তাবিচ। তার মধ্যে কাচের ঢাকন দেওয়া দু’টি মুখ—একজন বাঁশি বাজাচ্ছে আর একজন চেয়ে দেখছে তার দিকে।’

‘অবু, সে ছবি দেখেছ তুমি?

‘চাংড়াদিদি ঢাকন খুলে দেখালে তাই তো দেখলুম; বললে, এ তোমার মাসির মা-বাপের ছবি, ছেলেবেলায় তুমি এঁকেছিল। বলো না মাসি, কে তোমায় আঁকতে শিখিয়েছিল।’

‘চাংড়াদিদিকে শুধোলে না কেন, অবু? বলে দিতেন যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁর নাম।’

‘তুমি বল না।’

‘না অবু, গুরুজনের নাম মনে মনে জপ করতে হয়, মুখ ফুটে বলতে নেই।’

‘আচ্ছা, চাংড়াদিদিকে শুধিয়ে জানব।’

‘শোনো অবু, ছবি আঁকা যদি শিখতে চাও—নন্দদার কাছে, কি অসিতবাবুর কাছে, কি মুকুলদের কাছে শিখতে যেতে চাও তো বলো আমি পত্তর দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব বিশ্বভারতীতে, নন্দদা ছবি আঁকতে শেখান খুব ভাল।’

‘না মাসি, তোমাকে যিনি শিখিছিলেন তাঁকে পাই তো তাঁর কাছে শিখি।’

‘তিনি যে অনেক দূরে গেছেন অনেক দিন হলো। এখন আমার কাছে শিখবি, অবু?’

‘শোখাও তো শিখি, মাসি।’

‘তবে চাঁইবুড়োকে বল গা একটা ভাল দিন দেখতে। তোর হাতে খড়ি দিতে হবে।’

‘ওরে বাবা, ও মাসি, আবার হাতে খড়ি ক খ এইসব লিখে আরম্ভ করতে হবে?’

‘তা হবে না, অবু? ছবিও যে লেখার সামিল।’

‘থাক মাসি, তুমি তোমার ছবি লিখতে শেখার গল্প বলো, আমি শুনি। সেলেট-পেনসিল খড়ি-তক্তি কাগজ-কলম এসব হাতে নিলেই আমার ঘুম পায়।’

‘তবে চুপ করে বসে শোন না বলি—দেখ অবু, আমাকে যে সবাই মাসি বলে ডাকে তার কারণ হচ্ছে আমার ডাকনাম ছিল পূর্ণমাসী। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সবাই আমাকে মাসিই বলে আসছে। বাবা তখন নেই, মা আছেন। তোমার বয়সে একদিন মা বললেন, ‘পূর্ণমাসী, শোন, আমার একটি কথা রাখবি?’ আমি হাঁ না কিছুই বলি নে দেখে মা বলে চললেন : ‘জানিস ছোটবেলায় তুই ছবি দেখতে চাইতিস। বাইরের ঘরে একটা কি জানি কি কল ছিল তাতে চোখ দিয়ে বসলে কত দেশ-বিদেশের ঘরবাড়ি বাগান সব রঙিন ছবির মতো দেখা যেত। সে এক দিনের কথা, সেই কল নিয়ে তোকে নাড়াচাড়া করতে দেখে তোকে ভারি ধমকাই; দস্যি মেয়ে বলে পিঠে কিল বসিয়ে অন্দরে বন্ধ করি। সেই থেকে তোর মুখ দেখলেই কে যেন আমার মনে এসে ঘা দিয়ে বলে, ওকে ছবি আঁকা শেখানো চাই তোমার। কে এ কথা বলে তা বুঝি নে—অবোধ নারী। বেঁচে থাকতে তিনিও এই কথা বলতেন।

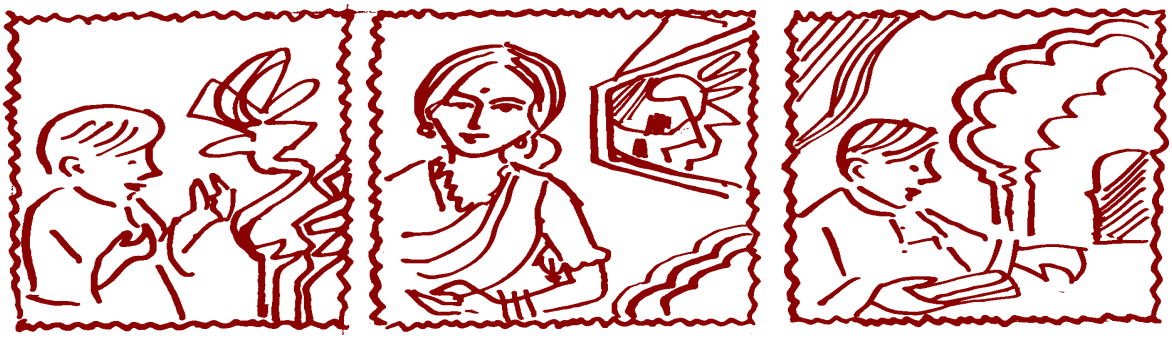

হয়তো এ তাঁরই হুকুম, আসে যায় এখনও, কে জানে। পূর্ণমাসী, বল তুই আঁকা শিখবি?’— ‘শিখব, মা’।’

‘মাসি, তুমি যে ছোটমাসি বনলতার কথা বলতে বলতে সেদিন বললে তোমার নাম ছিল দামিনী?’

‘অ, অবু, সেইটে বুঝি তুমি মনে করে রেখেছ। শোনো তবে বলি সে যে কাণ্ড হয়েছিল। বিয়ের রাতে ওই পূর্ণমাসী নাম নিয়ে মন্ত্র পড়তে গিয়ে আমার বর বেঁকে বসলেন, ‘আমি মাসি বলে একে ডাকতে পারব না। পূর্ণমাসী নামটা যেন মাসি মাসি শোনায়।’ সেই রাত্রেই আমার নূতন নাম দামিনী দিয়ে বাপ আমাকে সম্প্রদান করেন।’

‘এমন? আচ্ছা বলে যাও, মাসি।’

(বাকি অংশ পরের সংখ্যায়)

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. বাংলা ভাষার কোন লেখক একটিমাত্র গান রচনা করে চিরন্তন খ্যাতি পেয়েছেন? গানটির শুরুর অংশ কি? কোথায় রয়েছে?
২. ‘লোকমাতা’ কে কাকে বলেছিলেন? সেই লোকমাতার নামে এক বিখ্যাত লেখক বই লিখেছিলেন। বইটির নাম? লেখকের নাম?
৩. সূর্য-মন্দির ভারতের কোন্ রাজ্যে? কোথায়?
৪. কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান কোথায়?
৫. কুরুক্ষেত্র ভারতের কোন্ রাজ্যে?

উত্তর : ১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বন্দেমাতরম্। সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাম্ মাতরম্। আনন্দমঠ উপন্যাস। ২. রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। লোকমাতা নিবেদিতা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ৩. ওড়িশা। কোণারক। ৪. অসম। ৫. হরিয়ানা।

ফিরে পড়া

ধনধান্য পুষ্পভরা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক— সকল দেশের সেরা,
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

ভায়ের-মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
ওমা তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

নীরব, প্রচারবিহীন সেবাব্রতী শ্রীমতি লতা রাও

অঙ্গনা

আঁখি মহাদানী মিশ্র

সমাজে যে কত মানুষকে কতরকমভাবে সেবা করা যায় তা বিস্ময়ের বিষয়। দরকার শুধু সেবা করার মানসিকতা। মানসিকতা থাকলে সব কাজই সহজ হয়ে যায়।

এরকম সেবার মানসিকতা এবং তাকে বাস্তবে রূপদান করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বেঙ্গালুরুর শ্রীমতি লতা রাও।

ভারতের আই টি সেক্টর-এর কেন্দ্রবিন্দু হলো বেঙ্গালুরু, যে শহর 'সিলিকস ভ্যালি অব ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত। নিজেদের কেরিয়ার তৈরির জন্য সারা ভারত থেকে বহু উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাবান যুবক-যুবতী এখানে আসেন। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সী লতা রাও একজন সফ্‌টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এই প্রচলিত পথ থেকে অন্যপথে চলা শুরু করেন। টিভি সিরিয়াল দেখে বা পার্টিতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে তার মন সব সময় অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করতে ব্যস্ত। পথশিশুদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতো মহৎ কাজে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করেছেন।

পথশিশুদের পড়াচ্ছেন লতা রাও।

লতা রাও-এর নিজের ভাষায় আরও নিখুঁতভাবে বলা যায়, ''আমাদের বাড়ি যাঁরা তৈরি করেন, সেই সমস্ত রাজমিস্ত্রি ও অন্য শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততিদের দুরবস্থা দেখে আমি এই উদ্দেশ্যে কাজ করব বলে স্থির করি।''

পড়াশুনো শেষ করার পর একটি নামী সংস্থায় চাকরিতে যোগ দেন লতা। যথাসময়ে বিয়ে হয় শ্রীশ রাও-এর সঙ্গে, যিনি আই বি এম-নামক এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত। তাঁদের একটি মেয়ে— অপূর্বা। লতা রাওয়ের যখন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল কর্মরত রাজমিস্ত্রী এবং অন্যান্য কুলি, মজুরের শিশুদের দুরবস্থার চিত্র দেখে মন তৈরি করেন লতা রাও। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওইসব অবহেলিত শিশুদের পড়ানোর কাজে মনোনিবেশ করেন।

বেঙ্গালুরুর চিকাল্লাসানন্দ্রার কাছে উত্তরাহাল্লি মেন রোডে পুমাপ্রজ্ঞা লেআউট অঞ্চলে তিনি থাকেন। সেখানে যে বাড়ি তৈরির কাজ চলছে সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাতে বলেন।

পুমাপ্রজ্ঞা লেআউটের পাশে অঞ্জনিয়া মন্দিরে তাঁর প্রথম পাঠদান কেন্দ্রটি দীর্ঘ পাঁচ বছর চলেছিল। সে সময় তিনি পুমাপ্রজ্ঞা রেসিডেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট হয়গ্রীব আচার্য এবং অনেকের সাহায্য পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাঠদান কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয় এ.জি.এস. লেআউট-এ। একটি বস্তি অঞ্চলে তখন কাজ চলছিল। সেখানে নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে গেলে নতুন প্রজেক্ট যেখানে চলে লতা রাও সেখানেই যান। নির্মাণ কার্য যেখানে চলতে থাকে তারই একটি কোণে চলে তাঁর এই নীরব, প্রচারবিহীন, সকলের কাছে প্রেরণাদায়ী সেবার কাজ।

লতাকে এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ কিছু শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবক সবসময় নিয়োজিত আছেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— বিজয়লক্ষ্মী, শৈলজী এবং আরো অনেকে। এই কাজ তাঁর কেমন লাগছে— এই প্রশ্নের উত্তরে লতা রাও জানান, ''নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বুঝিয়ে তাদের শিশুদের পাঠদানকেন্দ্রে পাঠানোর কাজটা খুবই শক্ত। তারা চায় তাদের শিশুরাও তাদের সঙ্গে কাজ করুক তাদের সাহায্যকারী হিসাবে। উপার্জন করুক অল্পবিস্তর। কিন্তু আনন্দের বিষয় হলো এই প্রবণতার পরিবর্তন হচ্ছে। সমাজে অন্যান্য শিশুদের মতো তাদের শিশুরাও শিক্ষিত হবে— এই ভেবে তারা তাদের মন পরিবর্তন করছে।''

লতা রাও এবং তাঁর সহযোগীরা অরেকটি উপযুক্ত স্থান খুঁজছে তাঁদের পাঠদান কেন্দ্রের জন্য। তাঁরা স্পনসরও খুঁজছেন, কেননা তাদের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশি পরিমাণে খাতা, বই, ব্যাগ, পেন, পেনসিল, খেলার সরঞ্জাম, চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড দরকার পড়ছে। 'ইউথ ফর সেবা' (ওয়াই এফ এস) নামে একটি সমাজসেবা সংস্থা এই কাজে অগ্রসর হয়েছে। মদন বুলভোতা নামে এক মহানুভব ব্যক্তি তাদেরকে হ্যাপি ভ্যালি লেআউট-এর কাছে একটি জমি বিনামূল্যে দান করেছেন। পরবর্তীকালে এখানেই তাঁরা তাঁদের পাঠদানকেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করবেন। লতা রাও যে সমাজসেবার যে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

ইয়াজদী : মধ্য-প্রাচ্যে হিন্দুদের হারিয়ে যাওয়া এক জাতি

মধ্যপ্রাচ্যের আলবাগদাদীর জিহাদি উন্মাদনা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা অ-মুসলমানদের শিকার তৈরি করে রেখেছে। ক্রমানুসারে তারা সবচেয়ে প্রথমে ইসলামি আদব-কায়দা পালন না করা, হিন্দু-সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যকারী ইয়াজদী সমাজের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করেছে। হিন্দু-সংস্কৃতি ও রীতিনীতির অনুসারী এই 'ইয়াজদী'দের সঙ্গে ভারতের নৈকট্যের বিষয়ে লিখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক **মুজফ্‌ফর হোসেন।**

ময়ূর ও গরুড়ের পুজো, মাথায় টোপর এবং দীপ জ্বালানোর উৎসব যদি আপনি পৃথিবীর কোনো দেশে দেখেন তবে স্বাভাবিকভাবেই আপনার মনে হবে এতো আমার দেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরম্পরা। এগুলি যদি ভারত ও হিন্দু সমাজের অঙ্গ হয় তবে ওই লোকেদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মধ্য-প্রাচ্যের সাতলক্ষ লোক যাদের ইয়াজদী বলা হয় তারা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ঝুলছে। ভারত যদি তাদের না বাঁচায় তবে তাদের রক্ষা করবে কে?

আলবাগদাদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠার কার্যকলাপ মধ্য-প্রাচ্যে মানবতার ওপর ভীষণ বিপদ নেমে এসেছে। এজন্য আমেরিকা-সহ পৃথিবীর সমস্ত বড় দেশ এর বিরোধিতায় নেমেছে। এই অঞ্চলের কট্টরবাদীরা আবার উসমানী খিলাফত স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। মধ্য-প্রাচ্যের ভূমি কেবল পৃথিবীর তিন বড় ধর্ম— ইহুদি, খৃস্টান ও ইসলামের জন্মই দেয়নি, বরং অসংখ্য মতাদর্শ ও সমাজ এখানে উৎপত্তি হয়েছে। এই ধর্মগুলির উৎপত্তির আগে থেকেই এখানে অসংখ্য দেবী-দেবতার পূজার্চনা পারম্পরিক রূপেই হয়ে আসছিল। মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পাসংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মের প্রভাব শত শত বছর ধরে দূরদূরান্তে আজও দেখতে পাওয়া যায়। আরব সংস্কৃতির প্রভাবিত ক্ষেত্রে হুবল, সফা, নাইলা ও ইজ্জার মতো দেবী-দেবতারই নয়, অর্ধনারীশ্বররূপী দেবতারও অস্তিত্ব ছিল। ইতিহাসের সূচনাপর্বের অধ্যয়ন করা হলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, এই এলাকার সমাজ- সংস্কৃতিও ভারতের মতোই ছিল।

অত্যাচারের শিকার ইয়াজদীদের প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনধর্ম, কিন্তু এর উৎপত্তির পরেও অনেক মতাদর্শ এই দুই ভূভাগে সময়ে সময়ে উৎপন্ন হয়েছে। কালপ্রবাহে এর মধ্যে কিছু এখনো আছে, কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। সেগুলির অনেক কথার উল্লেখ এই তিন ধর্মের আসমানী গ্রন্থেও কোনো কোনো রূপে পাওয়া যায়। এজন্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্ব সত্ত্বেও মানব সভ্যতার এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায় যার মাধ্যমে এটা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় সভ্যতা ও

মধ্য-প্রাচ্যের সভ্যতায় অসংখ্য মিল ও সমান্তরাল প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। যজ্ঞ সঞ্চালন ও পরিচালনাকারীকে ব্রহ্মার রূপ মনে করা হয়। যজ্ঞ সম্পন্ন করার দায়িত্বকারীকে এখানে যজদী বলা হোত। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরো সমাজের নামই যজদী হয়ে যায়। তাদেরই আজ ইয়াজদী বলা হচ্ছে। কালান্তরে মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদ কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসেনকে হত্যা করে। তার সৈন্যদের এজিদী বলা হোত। প্রাচীন যজদী শব্দ সময়ের সঙ্গে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যজ্ঞের মতো ঘৃণিত কাজের ওপর পর্দা ফেলার জন্য এই সরল ও ভোলেভালা সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজদী করে দেওয়া হয়েছে। শিয়া মুসলমানরা ইমাম হুসেনের হত্যাকারী ভেবে এদের হত্যা করতে শুরু করে। এই প্রকারে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য হিন্দু সমাজের এক সম্প্রদায়কে ইয়াজদী নামে অভিহিত করে প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায় প্রাচীন হিন্দু সমাজের যজ্ঞ সম্পন্নকারী প্রতিষ্ঠিত জাতি ছিল। ইয়াজদী নাম দিয়ে অতীতকালের এই হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে।

বিগত দিনে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে ভীষণ যুদ্ধের লেলিহান শিখা দেখা গেছে, যার ফলস্বরূপ সিরিয়া, ইরাক এবং তৎসংলগ্ন ইজরায়েল ও ফিলিপাইন্সও জ্বলতে শুরু করে। এবার যুদ্ধের আগুনে আই এস আই এস (ISIS) নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এমন ইন্ধন জুগিয়েছে যে পৃথিবীর মহাশক্তিধর রাষ্ট্রও বিপদ গুনতে শুরু করে। মজহবি পাগলামির তুফান আমাদের মতোই নিরপরাধ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করা শুরু করে। শিয়া ও সুন্নিদের জায়গা দেওয়ার জন্য ইসলামের সমর্থকরা শক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। আর ইসলামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন লোকেদের বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছে। তারা তো ইসলামের অনুসারী ছিল না বা খৃস্টানদের সমর্থক ছিল না, তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে যে, এই লোকেরা কারা?

গবেষকরা এ বিষয়ে গবেষণা করে অবাক হয়ে গেছেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী ইয়াজদী সম্প্রদায় ভারতের হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা। তাদের রীতিনীতি, পূজাপদ্ধতি ও খাদ্যাভ্যাসের দিকে যখন মনোযোগ দেওয়া হয়, তখন পরিষ্কারভাবে এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এবং একবাক্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, ইয়াজদী সম্প্রদায় সেই প্রাচীন হিন্দু জনসম্প্রদায়, যারা ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বসবাস করছে। খলিফা বাগদাদীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই 'ভুলে যাওয়া' হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে ইসলামে পরিণত করা ও পরে তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে জিহাদের জন্য তৈরি করে নেওয়া। ইয়াজদীরা আজও প্রকৃতি-পূজক এবং মূর্তি তৈরি করে পূজা করে। এই আশ্চর্যজনক তথ্য হাতে আসার পর অনেক সংবাদপত্র এই ইয়াজদী সমাজের বিষয়ে খোঁজ করে অনেক রোমাঞ্চকর রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছে। এক তথ্য অনুসারে, এদের সংখ্যা সাত লক্ষেরও বেশি বলা হয়েছে। তাদের পরিপূর্ণ সমাজ আছে, রীতিনীতি ও পূজাপদ্ধতি আছে। যখন এই অঞ্চলে গবেষকরা পৌঁছন, তাঁরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এরা আর কেউ নয়, ভারতের হিন্দুসমাজ ও সনাতনধর্মেরই অনুসারী। এদের ওপর বৌদ্ধসংস্কৃতিরও গভীর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো, বুনিয়াদিরূপে তারা হিন্দুজাতির সেই শাখা যাদের জাতিভায়েরা কোটি কোটি সংখ্যায় আজও ভারতে বিদ্যমান।

বাগদাদী ও তার খিলাফতের সমর্থকরা এখন ইরাকের কুর্দিস্তান এলাকায় কি করছে— এর খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু এদের সবার ইচ্ছা ইয়াজদীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে জিহাদিদের ফৌজ তৈরি করে নেওয়া। এই নিরস্ত্র ইয়াজদীদের ওপর যে সময় অত্যাচারের চূড়ান্ত করা হচ্ছে এবং তাদের ধর্মান্তরিত করে সন্ত্রাসীশক্তি বাড়ানোর নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছে, সেই সময় পৃথিবীর ভীত-সন্ত্রস্ত বুদ্ধিজীবী এবং ভারতে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের ওপর এই দায়িত্ব এসে যায় যে, হিন্দু সমাজের এই অতি প্রাচীন শাখার হিন্দুদের রক্ষার বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিন্দুরাষ্ট্র ভারতের এটা কর্তব্য যে তারা তাদের ঐতিহ্য বা আস্থাকে রক্ষা করে।

ইয়াজদীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল যজ্ঞ করা। এজন্য তারা ইয়াজদী নামেই প্রসিদ্ধ হয়। সিরিয়ার এই অঞ্চলে আজও যজ্ঞবেদি যত্রতত্র দেখা পাওয়া যাবে। এরকম কোনো বসতি নেই যেখানে যজ্ঞবেদি দেখতে পাওয়া যাবে না। তারা উত্তর ইরাকের নিউয়েভ যার শুদ্ধ নাম নিউয়েভেহ-তে তাদের বসতি স্থাপন করে। এখানকার জিহাদিদের অভিযোগ ইয়াজদীরা মূর্তিপূজক, এজন্য ইসলামে তাদের হত্যা করার বিধান রয়েছে। আজ পর্যন্ত এই যাজ্ঞিকদের মন্দিরের দেওয়ালে প্রদীপের চিত্র দেখা যায় যা একটি স্ট্যান্ডে লাগানো থাকে। ভারতের দীপস্তম্ভের সঙ্গে এর খুবই সামঞ্জস্য আছে। এছাড়া মন্দিরগাত্রে ময়ূর ও গরুড়ের চিত্রও আছে। ললিশস্থিত এদের একটি মন্দির ভারতের মন্দিরের মতো দেখতে যা আজও সবাই দেখতে পাবেন। ত্রিকোণ আকারের মন্দির যা নীচে চওড়া এবং উপরে একবারে শঙ্কু আকৃতির চূড়ায় পতাকা উড়ছে— পরিষ্কার দেখা যায়। ভারতের সাধারণ মন্দিরের আকারপ্রকারের মতোই এখানকার মন্দিরগুলি। এদের মহিলারা শাড়ি পরিধান করেন এবং মাথা খোলা রাখেন। ময়ূর ও গরুড় দু'টিই সিরিয়া ও ইরাকের পরিবেশের পাখি নয়। এজন্য এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারতীয় জীবনপদ্ধতি ও হিন্দুমতাদর্শের খুবই প্রভাব এদের ওপর রয়েছে।

এখন প্রশ্ন যে, হিন্দু সংস্কৃতির বাহক এই ইয়াজদীদের কীভাবে রক্ষা করা যাবে? এরজন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংখ্যালঘু কমিশনের দায়িত্ব তো আছেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের হিন্দু সংগঠন এবং ভারত সরকারকে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে আমাদের হিন্দুভাইদের বাঁচানোর প্রয়াস করা একান্ত জরুরি। ভারতের মতো শক্তিধর রাষ্ট্র যদি তাদের পিছনে দাঁড়ায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা ভারতের অধিবাসী, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির খুব বড় সেবা করতে পারবো। আরও ভালো হয় যদি বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে এই ইয়াজদীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন শুরু করা হয়। নিউইয়র্ক টাইমস্-এ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমার বিনীত অনুরোধ, এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে কোনো দিশা নিশ্চিত করা হোক। ভুলে থাকার মতো বন্ধু তো নয় ইয়াজদীরা! ■

প্রধানমন্ত্রীর ‘শ্রমেব জয়তে’ অভিযান কি শ্রম আইন সংস্কারের ইঙ্গিত?

এন. সি. দে

আমাদের নয়া প্রধানমন্ত্রী এক মৃতপ্রায় জাতির মনে যে জাতীয় অস্মিতা জাগাতে সিদ্ধহস্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে দেশের মধ্যে প্রচারিত তার বিভিন্ন প্রকল্পই হোক, কিংবা বিদেশে অনাবাসী ভারতীয়দের মাঝে ভাষণেই হোক। ‘স্বচ্ছ ভারত গঠনে’ গান্ধীজীর জন্মজয়ন্তীকে সঠিক ব্যবহারে তাঁর মুন্সিয়ানায় তা প্রমাণিত; সানিয়া মির্জার মতো পাকিস্তানি প্রেমীকেও তিনি ঝাড়ু ধরিয়েছেন। ‘শিক্ষক দিবস’-কে ‘গুরু দিবস’ হিসাবে পালনের ডাক দিয়ে তিনি সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। উন্নত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তুলতে সাংসদদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে উন্নয়নের এক সামাজিক দায়বদ্ধতার জোয়ার এনেছেন মানুষের মনে। মঙ্গলযান Mars Orbiter Mission (MOM)-এর মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে অবতরণকে তিনি বলেছেন, এ যেন মঙ্গলগ্রহ তার মম্ (মা-কে) পেল। এই কথার মাধ্যমে তিনি যেমন ভারতীয় জাত্যভিমান জাগ্রত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিন্দুকদের খরচের বাহানার জবাবে বলেছেন, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমেরিকার যে মঙ্গলযান ‘মাভেন’ মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে ছিল, তাতে আমাদের এম ও এম-এর চেয়ে দশগুণ বেশি খরচ হয়েছিল। তাঁর মতে, হলিউডের ছবি ‘গ্র্যাভিটি’ বানাতে যা খরচ হয়েছে, তার চেয়ে কম ব্যয়ে মঙ্গলযান পৌঁছেছে লালগ্রহের কক্ষপথে। এই জয়কে ক্রিকেটে ভারতের জয়ের আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে, মহাকাশ গবেষণাকে সাধারণ মানুষের মাঝে নিয়ে এসেছেন।

চীন-জাপানে গিয়েও তিনি তাঁর কথার মায়াজালে মোহিত করেছেন তাঁদের। জাপানি ব্যবসাদারদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, —ভারত তাঁদের স্বাগত জানাবে রেড কার্পেট দিয়ে, ‘রেড টেপ’ দিয়ে নয়। নেপাল-ভুটানেও তাই করেছেন। মার্কিন মুলুকে গিয়ে সেদেশে বসবাসরত অনাবাসী ভারতীয়দের আয়োজিত নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের সমাবেশে তিনি আবেগতাড়িত করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের। ভারতরাষ্ট্র নির্মাণে তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আবেগাপ্লুত হয়েছেন। এই আবেগের পুরস্কার হিসাবে তাঁদের জন্য আজীবন ভিসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন।

মার্কিন মুলুকে বসবাসরত ভারতীয়দের হৃদয় তিনি জয় করেছেন ঠিকই কিন্তু মার্কিন শিল্পপতিদের হৃদয় তিনি কতটা জয় করতে পেরেছেন, তার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে দেশে ফেরার অব্যবহিত পরেই তিনি নেমেছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নামাঙ্কিত ‘শ্রমেব জয়তে’ অভিযানে। এই অভিযানের ঘোষিত উদ্দেশ্য শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। তাঁর ভাষণেও তিনি বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ‘আই. আই. টি.’ ও ‘আই. টি. আই’ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কৌলিন্য প্রথা বা মানসিকতা দূর করতে হবে। শ্রমের ক্ষেত্রে ‘হোয়াইট কালার’ উন্নাসিকতা ঘোচাতে হবে। এক্ষেত্রেও তাঁর ভাষণের জন-মনমোহিনী প্রভাব অনস্বীকার্য।

কিন্তু এসবই তাঁর বাক্‌চাতুরী, এর প্রভাব সব সময়ই হয়ে থাকে তাৎক্ষণিক, যতক্ষণ বা যতদিন না তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। বাক্যের সার তার কার্যকারীতার উপর নির্ভরশীল, অন্তসারশূন্য বাক্য চিরদিনই উপহাসের বিষয়। বাক্‌চাতুরীর দ্বারা ব্যক্তির উত্থান সম্ভব, রাষ্ট্র-জাতি ও তার জনগণের উত্থান তা দিয়ে হয় না। রাষ্ট্রের এবং জাতির উত্থান সম্ভব একমাত্র তার সংগঠনের উত্থানের দ্বারা। শক্তিশালী হিন্দু রাষ্ট্র ও জাতির উত্থান সম্ভব শুধুমাত্র শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনের মাধ্যমে। হিন্দুত্ববাদীদের কাছে গুরু তাদের গৈরিক ধ্বজা, কোনো ব্যক্তি নয়। জাতীয় আবেগের উপর নির্ভর করে কোনো ব্যক্তির উত্থান শুধু ডেকে আনতে পারে এক ভয়াবহ ফ্যাসিস্ত রাজ।

তাই শুধু বাক্‌চাতুরী নয়, আসুন নরেন্দ্র মোদীর বাস্তব কর্মদক্ষতার কিছু নিদর্শন পরখ করি। এর আগে এই পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক নিবন্ধে লেখা হয়েছে শ্রম আইন সংস্কার কখনই শ্রমজীবীদের স্বার্থে হতে পারে না। কারণ এই সংস্কারের পৃষ্ঠপোষক ইউরো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। বিশ্ব পুঁজিবাদের দোসর এই সাম্রাজ্যবাদীরা কখনই নিজেদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করতে পারে না। আমেরিকা থেকে ফিরেই নরেন্দ্র মোদী যেভাবে শ্রমসংস্কারের অভিযানে নেমেছেন তাতে শ্রমজীবী মহলে কিঞ্চিৎ চিন্তার উদ্রেক হয়েছে, যেমন ‘হোয়াইট কালার জবে’র বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গার থেকে মনে হচ্ছে তিনি কংগ্রেস সরকারের মতোই সমগ্র ভারতকে ‘অসংগঠিত শ্রম’ (Unorganised Sector) ক্ষেত্রে পরিণত করতে চলেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডের একই নম্বর সমগ্র কর্মক্ষেত্রে চালু করার মধ্যে চাকুরিতে নিত্য কর্মচ্যুতি অর্থাৎ নিশ্চিন্ত চাকুরিজীবনের ইতি’র দিন আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে শ্রমজীবীদের স্বার্থে রয়েছে বিভিন্ন আইন। তার মধ্যে যেমন রয়েছে চাকুরিকালীন নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরি আইন, দুর্ঘটনায় মালিকের দায়-দায়িত্ব, বেতন ও বিভিন্ন ভাতা সংক্রান্ত আইন, শিল্প-বিরোধে মালিককে আইন মানতে বাধ্য করাতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন (লেবার কমিশন, লেবার ট্রাইবুনাল, প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশন ইত্যাদি)। গত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ব পুঁজিবাদ তার দোসর ডব্লুউ টি ও-র মাধ্যমে এই সকল শ্রমিকদরদি আইন তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। তারই গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে

'শ্রম আইন সংস্কার'।

স্মরণ থাকতে পারে যে নরেন্দ্র মোদীর চীন-জাপান ভ্রমণে কিছু কিছু বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি মিললেও আমেরিকা কিন্তু এমন কিছুই প্রতিশ্রুতি দেয়নি। কিন্তু পর্দার আড়ালে যে কিছু কিছু চুক্তি হয়নি, তা কিন্তু নয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত-মার্কিন সরকারের মধ্যে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, 'দুই দেশের নেতৃবৃন্দ একটি বার্ষিক উচ্চ পর্যায়ের Intellectual Property Working Group গঠন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে, যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারিগরী সভা করবে।' আমেরিকাকে দেওয়া ভারতের এই প্রতিশ্রুতি ভারতের ওষুধ শিল্পে ডেকে আনবে এক ভয়াবহ পরিণতি। বৃহৎ মার্কিন ওষুধ শিল্পগোষ্ঠী এই Working Group-কে ব্যবহার করবে ভারতের পেটেন্ট আইনে নিরাপত্তার বিধান তুলে দিতে বা খর্ব করতে, যা চিরকাল তাদের চক্ষুশূল। এই বিবৃতির এক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন ট্রেড কমিশন সোৎসাহে আমাদের পেটেন্ট আইন রিভিউ করার কাজে নেমেও পড়েছে। গত দু-বছর ধরে মার্কিন সরকার আমাদের পেটেন্ট অফিসের কম দামে ওষুধ বিক্রির জেনেরিক ওষুধের ভারতীয় কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়ার বিরোধিতা করে আসছিল। ভারতীয় কোম্পানি কিডনির ক্যানসারের ওষুধ বিক্রি করছে মাত্র ৮,৮০০ টাকায়, বিদেশি Bayer কোম্পানিকে সেই ওষুধই বিক্রি করে ২,৮০,০০০ টাকায়। ভারতীয় কোম্পানিকে খর্ব করতে না পারলে তাদের চলবে কেন? এবার নরেন্দ্র মোদী তাদের সেই সুযোগই করে দিলেন।

নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা ভ্রমণের কিছুকাল আগে বিদেশমন্ত্রক ঠিক করে আমেরিকায় বাসমতি চাল ও ফল রপ্তানির অনুমতির বিনিময়ের মার্কিন পশু মর্গে গুদামজাত পচা চিকেন লেগ আমদানির দরজা খুলে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমেরিকায় মুরগির ঠ্যাঙ কেউ খায় না। গত ১০ বছর ধরে ওদের গুদামে এরকম লক্ষ লক্ষ টন ঠ্যাঙ পচছে মার্কিন সরকার ডব্লুউ টি ও-র উদার বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে গরিব দেশগুলোর বাজারে এই পচা ঠ্যাঙ ডাম্প করছে দাম নিয়ে। এই সস্তা দরের ডাম্পিং-এর ধাক্কায় ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম এবং মেক্সিকো'র পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। রাশিয়ার পোল্ট্রি শিল্পও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কারণে ওই সমস্ত দেশ বাধ্য হয়েছে আমেরিকা থেকে মুরগির মাংস আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে। আমাদের দেশের সরকার উল্টে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে। এই সিদ্ধান্তে এদেশের পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা অবিলম্বে এই আমদানি বন্ধ অথবা বিপুলহারে ডাম্পিং বিরোধী ট্যাক্স চাপানোর দাবি জানিয়েছে। আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপথে ডব্লুউ টি ও-র সাহায্য নিয়ে ভারতকে শাসানো শুরু করেছে।

ভারতীয় শিল্পকে বৃহৎ বিদেশি কোম্পানির প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রক্রিয়া আগের সরকারের মতো এই সরকারও চালু রেখেছে। বরং একটু তাড়াহুড়োই যেন বেশি করছে। বীমা শিল্পের মতো মূলধনী ঝুঁকিহীন শিল্পেও বিদেশি লগ্নির দরজা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ও এন জি সি-র মতো লাভজনক ও জাতীয় সম্পদের উৎস-সন্ধানী সংস্থাতেও বিদেশি লগ্নীর দরজা খোলা হচ্ছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেখার বিক্রির মাধ্যমে। ওষুধ শিল্পেও এতদিন ২৪ শতাংশের বেশি লগ্নি করতে সরকারের অনুমোদন দরকার হোত; এখন থেকে বিদেশি লগ্নিতে সরকারের অনুমোদন বাধ্যতামূলক রইল না। এই হলো আমাদের নয়া রাষ্ট্র নির্মাতা পুরুষের আসল চেহারা।

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে মার্কিন আধিপত্যের সহায়ক আই এম এফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর মোদী-স্তুতি। মোদীর একের পর অর্থিক সংস্কার অভিযানে উৎসাহী হয়ে আই এম এফ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছে, ভারত নাকি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ক্রমশ এগিয়ে চলবে। ২০১৪-এ অগ্রগতি হবে ৫.৬ শতাংশ। আর ২০১৫-তেই হবে ৬.৪ শতাংশ। World Bank Group President Jim Yong Kim-তো এতটাই মোদীতে মোহিত হয়ে পড়েছেন যে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর ভারত অতি দ্রুত র‍্যাঙ্কিং-এ এগিয়ে যাবে।

পরিশেষে, সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস সরকার এটা রেওয়াজ-এ পরিণত করেছিল যে সরকারকে পরামর্শ দেবে মার্কিন আজ্ঞাবহ আই এম এফ / ডব্লুউ বি-এর পাঠানো একজন বা একাধিক পরামর্শদাতা। কংগ্রেস সরকার বিদায় নেওয়ার পর সেই সব মার্কিন আজ্ঞাবহ পরামর্শদাতারাও বিদায় নিয়েছিল। প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে এর আগে এসেছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে কৌশিক বসু; তারপর আসেন আই এম এফ থেকে রঘুরাম রাজন। যিনি তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হয়ে আছেন। গত আগস্ট (২০১৩) থেকে এই পদ খালি রয়েছে। আশা ছিল এবারের প্রধানমন্ত্রী এবং আই এম এফ/ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আজ্ঞাবহ পরামর্শদাতা বর্জন করবেন। কিন্তু আমেরিকা থেকে ফিরেই তিনি সেই কুখ্যাত আই এম এফ/ডব্লুউ বি/ডব্লুউ টি ও থেকে আসা ড. অরবিন্দ সুব্রামানিয়ামকে করলেন তার প্রধান অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা। এঁরও শিক্ষা- দীক্ষা সবই বিদেশে। ইনিও রঘুরাম রাজনের পথের অনুসারী। অর্থবিষয়ক সচিব পদে নিয়ে বলেন রাজীব মেহরিশিকে। তিনিও গ্লাসগো থেকে এম বি এ করেছেন। ইনিও মার্কিন তক্‌মাওয়ালা আর্থিক সংস্কারের গোঁড়া সমর্থক। কংগ্রেসী-বৃত্ত এভাবেই সম্পূর্ণ হলো।

এর কুফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার স্বার্থে সাধারণ মানুষের জমানো টাকার উপর সুদ ব্যাঙ্কগুলি কমিয়েই চলেছে কংগ্রেস আমলের মতোই।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য এতকাল ধরে চলে আসা দশমিক ৫০ শতাংশ বাড়তি সুদের সুবিধাও সরকারি স্টেট ব্যাঙ্ক কমিয়ে করে দিয়েছে দশমিক ২৫ শতাংশ।

কংগ্রেসের সঙ্গে আর্থিক নীতিতে কি বিজেপি-র কোনোই প্রভেদ নেই? তাহলে সঙ্ঘের শেখানো এতকালের জাতীয় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির কি হবে? মোদীকে এখনই প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতীয় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি কেবল আমাদের স্বপ্নেই থেকে যাবে। বিজেপি সম্পর্ক স্বপ্ন ভঙ্গ হলে তা কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য জাতীয় আর্থিক বিকাশের আন্দোলন বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

সংস্কৃতং বিনা ভারতীয়াঃ অসংস্কৃতা এব

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৭ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট সংস্কৃত সপ্তাহ পলিত হয়েছে। এই বঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হতে হতে প্রায় অবলুপ্তির পথে চলেছে। এই ভাষাকে বিশ্বের দরবারে নিজেদের গৌরবময় অস্তিত্বের জনক মেনে তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় এই লেখা নিবেদিত হলো মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি দিয়ে।

সংস্কার শব্দটি থেকেই সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি। সংস্কার ক্রিয়া দ্বারা বোঝানো হয় ত্রুটিমুক্তি, উৎকর্ষের বৃদ্ধি ইত্যাদিকে। জীর্ণ গৃহের সংস্কার, নদীর সংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখি।

সংস্কার শব্দটি দ্বারা ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ইত্যাদিও বোঝায়, যেমন সহজাত সংস্কার, কুসংস্কার ইত্যাদি।

আদি শঙ্করাচার্য তিনভাবে সংস্কারের উপায় বলে গেছেন। প্রথমটি গুণাধান অর্থাৎ গুণগ্রহণ ও তা সঞ্চিত রাখা। দ্বিতীয় পদ্ধতি দোষাপনয়ন বা ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে তার অপনয়ন করা বা দূরীকরণ করা। তৃতীয় প্রক্রিয়া হলো হীনাঙ্গপূর্তি অর্থাৎ অভাবকে চিহ্নিত করে তার পূরণ করা।

সংস্কৃত একটি গুণবাচক শব্দ অর্থাৎ যে বস্তু বা বিষয়ের সংস্কার সাধিত হয়েছে। সংস্কৃত ভারতের প্রাচীনতম ভাষাও। বহুবিধ সংস্কারের মধ্য দিয়ে ত্রুটিমুক্ত হওয়া এক বিশিষ্ট ভাষার নাম সংস্কৃত। এই ভাষার গুণাধান, দোষাপনয়ন ও হীনাঙ্গপূর্তি যথাযথভাবে হয়েছে বলেই ভাষাটি সংস্কৃত অভিধা লাভ করেছে। সংস্কৃত পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত।

সংস্কৃত ছিল প্রাচীন ভারতের ভাষা। বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতের আদিরূপ দেখা যায়। পরবর্তীকালে মহর্ষি ব্যাস এই ভাষাতেই মহাভারত রচনা করেন, বাল্মীকি রচনা করেন রামায়ণ। বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় কঠিন হলেও মহাভারতের কাল নির্ণীত হয়েছে ব্যাসদেব বর্ণিত নানা ঘটনার সময়ে আকাশে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের কথা জেনে। বর্তমানে যন্ত্রগণকের যুগে সেই কাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে Panchanga Software, Planetarium Software, Sky Map ইত্যাদির সাহায্যে। সেই সকল মহাজাগতিক গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ নির্ভুলভাবে চিত্রায়িত হয়েছে যন্ত্রগণকের পর্দায়। সেই অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় ৩০৬৭ খৃস্টাপূর্বাব্দে। এভাবেই বলা চলে সংস্কৃত ভাষার সময় কাল ছিল অবশ্যই প্রায় ছয় হাজার বছর আগে এবং সংস্কৃতের প্রাচীনতাও তার থেকে কম নয়।

মহাভারতের পরবর্তীকালে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, কপিল, কণাদ, বৌধায়ন, কালিদাস, বররুচি-সহ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সকল বিদ্বজ্জন, কবি ও লেখক তাঁদের রচনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন এই ভাষাতেই। এই ভাষায় সৃষ্ট জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইতিহাসের ভাণ্ডার বহুসহস্র বছর ধরে মানুষের চিত্তলোক আলোকিত করে এসেছে। পৃথিবীর সব প্রান্তের প্রধান ভাষাগুলিতে সেই সকল রচনা অনূদিত করে মানুষ নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে।

জার্মানরা নিজেদের আর্যদের বংশধর বলে। সেই গৌরব যে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের প্রাপ্য পশ্চিম দুনিয়া তা স্বীকার করতে চায় না। জার্মানদের আর্যত্বের দাবি আছে কিন্তু সংস্কৃত ভাষা তাদের কাছে নেই। ভারতের প্রাচীনত্বে দাবি আছে ও সেই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আছে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃত ও তজ্জাত সমুদয় ভারতীয় ভাষা।

স্বর্গীয় জগদীশ চন্দ্র বসাক

জন্ম : ৩রা ফাল্গুন, বুধবার ১৩৩৯ সাল

প্রয়াণ : ৫ইকার্তিক ১৪২১, বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট

আগামী ৭ই নভেম্বর ২০১৪, শুক্রবার আদ্যশ্রাদ্ধ

স্থান : সমুদ্রগড়, বর্ধমান

শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাই আমন্ত্রণ

তোমার পথই আমাদের দিশা

সৌজন্যে

বসাক কনসার্ন

(পাইকারী তাঁত শাড়ি বিক্রেতা)

সমুদ্রগড়, পো : নসরৎপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৫১৯

যোগাযোগ : ৯০০২৩৫৭৭৮৮, ৯৯৩২৪৮৬১৯৫, ৯৭৩২২২৫৫৯৮

অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংস্কৃত তার আদিলগ্ন থেকে যুক্ত রয়েছে কেবলমাত্র ভারতেরই সঙ্গে।

সংস্কৃত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জনক। শুধু ভারতীয় ভাষাগুলিরই নয় বরং বলা চলে সকল ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর উপর প্রভাবকারী এক মহান ভাষা।

জার্মানিতে বহু বছর ধরে অনেকে যত্ন সহকারে সংস্কৃতের চর্চা করে আসছেন। আমেরিকাও প্রশংসনীয় ভাবে সংস্কৃতের চর্চা করছে। জার্মানির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা রায় দিয়েছেন কমপিউটার- বান্ধব ভাষা হিসাবে সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম স্থানটি প্রাপ্য সংস্কৃতের। কারণ এই ভাষায় রয়েছে সুসংবদ্ধ ব্যাকরণ, নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ও ব্যুৎপত্তি-সহ বিপুল সংখ্যক শব্দ নির্মাণের সামর্থ্য যা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার নেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, শুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণের দ্বারা মুখগহ্বরের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয় তা মানুষের বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করে। এই জন্যই উচ্চারণের বিকৃতি রোধ করার উদ্দেশ্যে আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা বহু যুগ ধরে বেদকে শ্রুতির পর্যায়েই আবদ্ধ রেখেছিলেন এবং অনুনাসিক সংস্কৃত বর্ণমালার বর্গ অনুসারে বিন্যাস, প্রতি বর্গে মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণ বর্ণের নির্দিষ্ট অবস্থান অন্য কোনো ভাষায় যে নেই একথা সত্য। ভারতীয় যোগী-সাধকদের তত্ত্ব অনুসারে আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত ষট্‌চক্রের প্রতিটি পুষ্পদন একটি ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত। স্থূলজগতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি বিভিন্ন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের কম্পাঙ্কের নানাবিধ সংযোজনের মাধ্যমে হয়েছে।

স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর এক রিপোর্টে মন্তব্য করেছিলেন ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। এই শিক্ষা চরিত্র নির্মাণও করবে। বর্তমান পৃথিবীতে আধুনিক বস্তুবাদী জ্ঞানের সঙ্গে চিরাচরিত আধ্যাত্মিকতা যুক্ত না হলে মানুষের অতৃপ্তি ও হতাশার অবসান হবে না। পশ্চিমী জগত যে আধ্যাত্মিকতার দিকে ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছে তার মূলগত কারণও এইটি। সংস্কৃতকে দেবভাষা বলা হয়। এই ভাষায় রচিত কোনো বিষয় কখনও কোথাও কোনো মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়নি। এই ভাষার সকল রচনা চিরাচরিত কাল ধরে সকলের কল্যাণে আনন্দের উপকরণ জুগিয়ে আসছে। এই ভাষাতে যেমন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ঋষিরা নিজেদের উপাস্য দেবদেবীর বন্দনা গান করেছেন তেমনই করেছেন মহানাস্তিক পণ্ডিত চাণক্য মানবজীবনের বাস্তব দিকগুলির বর্ণনা। তাই এই ভাষা দেবভাষা, সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বের এক ভাষা যা সমগ্র বিশ্বকে মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

এই বঙ্গে আত্মঘাতী বাঙালি সংস্কৃতকে সাম্প্রদায়িক তক্‌মা দিয়ে জনজীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বৃটিশ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা মন্দাক্রান্তা বসু দূরদর্শনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, সংস্কৃতের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারকে অন্যের মাধ্যমে না জেনে নিজে সে সব পড়ে জানা উচিত। কিন্তু সংস্কৃতের গায়ে ধর্মের তক্‌মা লাগিয়ে ভাষাটিকে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে। এতে নিজেদের ক্ষতি, সবার ক্ষতি। তবু আশার কথা, এসব তঞ্চকতায় না ভুলে কিছু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ সংস্কৃত চর্চায় নিজেদের যুক্ত রেখে চলেছেন। মুম্বইয়ের পণ্ডিত গুলাম দস্তগীর বিরাজদার, লখনউয়ের নাদওয়া মাদ্রাসার পণ্ডিত মুফ্‌তি মোহম্মদ সারোয়ার ফারুখী, উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জের আশাব আলি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠরত আরও অনেক বিদ্বজ্জন সংস্কৃতকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে এই ভাষার চর্চা করে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন। পণ্ডিত গুলাম দস্তগীর বিরাজদার বারাণসীস্থিত বিশ্ব সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর পাণ্ডিত্যকে সম্মান জানিয়ে মুম্বইয়ের বহু পরিবার তাঁদের পারিবারিক পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে পৌরোহিত্যের আহ্বান জানান। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে একথা পাঠ করার পর মনে আশা জাগছে দেশ থেকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ লুপ্ত হয়ে যায়নি। আশা জাগছে, মানুষ ঠিকই যার যেখানে স্থান তাকে সেখানে পৌঁছে দেবে এবং এভাবেই আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ভারতের উদয় হবে।

(লেখিকা প্রাক্তন অধ্যাপিকা)

Happy Dewali

VIKRANT

গায়ত্রী পরিবারের মহাশ্রম দান

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এ সাড়া দিয়ে ভারতের সাধু-সন্ত থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি, চিত্রতারকা, খেলোয়াড় এমনকী অতি সাধারণ মানুষও হাতে ঝাড়ু তুলে নিয়েছেন। শ্রমদানে সৎ সঙ্কল্পযুক্ত হয়ে মহাশ্রমদান তৈরি হয়েছে। এরকমই শ্রমদানের একটি ঝলক প্রতিদিন দেখতে পাওয়া যায় হরিদ্বারের হৃদয়স্থল হর কী পৌড়ি থেকে ললিতরাও সেতু পর্যন্ত। গঙ্গাপরিষ্করণ কার্যক্রমের অঙ্গস্বরূপ অখিল বিশ্ব গায়ত্রী পরিবারের হাজার হাজার হলুদবসনধারী সদস্য হাতে ঝাঁটা, কোদাল, বালতি নিয়ে জীবনদায়িনী মা গঙ্গার সেবায় লেগে পড়েন। হরকী পৌড়ি থেকে ললিত রাও সেতু পর্যন্ত আটটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গায়ত্রী তীর্থ শান্তি কুঞ্জের কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রায় সাত হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক নিজ নিজ ভাগে গঙ্গায় ভেসে আসা ফুল, মালা, আবর্জনা ও গঙ্গার পাড়ে মানুষের ফেলে দেওয়া খাবারের ঠোঙা, প্লাস্টিকের ব্যাগ এমনকী কুকুর বিষ্ঠাও অক্লেশে ঝুড়িতে তুলে নেন। কখনো কখনো তীর্থযাত্রী ও সাধারণ পথচারীরাও এই সেবাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। সবাই মিলে মানবশৃঙ্খল তৈরি করে প্রতিদিন গঙ্গা থেকে কয়েক টন আবর্জনা তুলে নিয়ে দূরে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করেন।

অখিল বিশ্ব গায়ত্রী পরিবারের প্রধান প্রণব পণ্ড্যা জানান, ''গায়ত্রী পরিবার গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত মা গঙ্গার পরিষ্কারের দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা ২০২৬ সাল পর্যন্ত নিরন্তর এই কাজ করে যাব।'' ড. পণ্ড্যা প্রধানমন্ত্রীর 'সাংসদ গ্রাম যোজনা'র উল্লেখ করে বলেন যে, হিমালয় আমাদের মায়ের বাড়ি। মায়ের বাড়ি থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি পর্যায়ে এই পরিষ্কারের কাজ করবো। তিনি আরও জানান যে, গঙ্গার দুই পাড়ে থাকা গ্রাম ও শহরের মানুষদের এই পবিত্র নদী শুদ্ধ রাখার জন্য জনজাগরণ অভিযান চালানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশের অন্যান্য নদী ও জলাশয়ও যাতে শুদ্ধ থাকে তার জন্যও জোরদার অভিযান চালানো হচ্ছে। কলকাতা থেকে আসা গায়ত্রী পরিবারের এক ভক্ত জানান— এই আন্দোলনের সুফল দিতে শুরু করেছে। কলকাতায় গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জনের আগে লোকেরা স্বতস্ফূর্তভাবে ফুল, মালা খুলে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিচ্ছেন। অখিল বিশ্বগায়ত্রী পরিবারের প্রধান মা গঙ্গার সেবায় হাতে ঝাঁটা-ঝুড়ি নিয়েছেন, আর সেই পরম্পরারই অনুসারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হাতে ঝাড়ু তুলে নেবেন— এ খুবই স্বাভাবিক।

গঙ্গা পরিষ্কারে গায়ত্রী পরিবারের সদস্যগণ। ইনসেটে পরিবারের প্রধান ড. প্রণব পণ্ড্যা।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"প্রত্যেক যুগের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তার নূতন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। জাতীয়তা এযুগের ধর্ম। জাতীয়তার পশ্চাতে রয়েছে ভারতের বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি, জাতীয়তার মধ্যেই মিলিত হয়েছে তার প্রবল ধর্মানুরাগ।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

এনসেফেলাইটিস রোগ ও তার প্রতিকার

ডাঃ মলয় সাহা

এনসেফেলাইটিস একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই ভাইরাস যখন মস্তিষ্কে সংক্রমণ ঘটিয়ে (Temporal Lobe) তা স্ফীত করে দেয় তখন তাকে আমরা এনসেফেলাইটিস বলি।

প্রধানত, দুই রকম এনসেফেলাইটিস হয়।

এক, এনসেফেলাইটিস ভাইরাস যখন মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সরাসরি আক্রমণ করে এবং তা স্ফীত হয়ে যায়। দুই, যখন এই ভাইরাস মানব শরীরের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করে এবং সঠিক চিকিৎসার অভাবে তা মস্তিষ্কে সংক্রমিত হয়।

ভাইরাসের নাম : (১) Herpes Virus : যার মধ্যে মূলত Herpes Simples Virus (HSV) এনসেফেলাইটিসের জন্য দায়ী।

এরা মূলত দুই রকম হয়।

HSV-I—দূষিত খাবার, পানীয় জল বা যৌন সম্পর্ক থেকে এই ভাইরাস ছড়ায়।

HSV-II—এই ভাইরাস নবজাত শিশু থেকে ৫ বছরের শিশুদের সংক্রমিত করে।

(২) Arovivirus— এর বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে : West Nile Enchephelitis, Eastern Equine Enchephelitis, Eastern Enchephelitis, St. Louis Enchephelitis, La Cross Enchephelitis. যার মধ্যে মূলত Eest Nile বা Japanese Enchephelitis উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। এই ভাইরাসটি মূলত টিকপোকা বা মশার কামড়ে হয়। এই মশাটি প্রধানত রাত্রিবেলা কামড়ায়। এই মশাটি হালকা বাদামী রং-এর হয় এবং তার উপর সাদা ছোপ থাকে।

এই রোগটি ছড়ানোর অন্যতম বাহন হলো শুয়োর এবং পরিযায়ী পাখি। এরা নিজেরা আক্রান্ত হলে তা পরিবেশে ছড়ায়। যদি কোনো পোকামাকড় (টিকপোকা/মশা) এদের কামড়ায় এবং সেই বাহক মশাটি যখন কোনো মানুষকে কামড়ায়, তখন ভাইরাসটি আমাদের শরীরকে সংক্রমিত করে।

মানব শরীরে এই রোগের ভাইরাস প্রবেশের ২-১০ দিন বাদে বিভিন্ন উপসর্গ তৈরি হয়। এই রোগে প্রধানত আক্রান্ত হয় ১২ বছরের কম বাচ্চারা (যার মধ্যে ৪০ শতাংশ ৫ বছরের কম শিশু) এবং ৫৫ বছরের অধিক বয়স্করা। তবে যে কোনো বয়সের মানুষই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় মহিলারা অধিক হয়। যারা অপুষ্টিতে ভুগছে বা যক্ষ্মা রোগের নিরাময় হয়নি— তারাই এই রোগের সহজ শিকার। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই রোগের আক্রমণে মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু হয়।

উপসর্গ : প্রথমে শুরু হয় জ্বর। প্রচণ্ড মাথা ধরা। বমি বা বমির ভাব। শারীরিক দুর্বলতা। সারা শরীরে ব্যথা। কাঁপুনি বা ফিট হয়ে যাওয়া।

এর ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে :

প্রায়ই কাঁপুনি বা ফিট হওয়া। ভুলে যাওয়া। ঘাড় বা শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে যাওয়া। ভুল বকা। কথা জড়িয়ে যাওয়া। কানে কম শোনা। চোখে আবছা দেখা। শরীরের কোনো একটি অংশ অবশ হয়ে যাওয়া। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। মস্তিষ্ক স্ফীত হওয়া বা জল জমা, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, শরীরের বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া। তবে নবজাতক বা শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর, বারবার বমি করা, মাথার উপর ফুলে যাওয়া, সব সময় কাঁদা। এইসব লক্ষণ দেখলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ বা ফিভার ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে।

চিকিৎসা : এনসেফেলাইটিস রোগ নিশ্চিত হওয়ার পর চিকিৎসা শুরু করতে হবে। সাধারণ এনসেফালাইটিস বা Herpes Simplex (HSV-I or HSV-II) আক্রান্ত হলে Acyclovir ঔষধ (Antiviral) খুব ভালো কাজ করে। মস্তিষ্ক স্ফীত হওয়ার জন্য Cortico Steroid দেওয়া হয়। যদি ফিট হয় তবে রোগীকে Anticonvulsive Drug দিতে হবে। জ্বরের জন্য (১০০° ওপর হলে) প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিতে হবে। যদি প্রয়োজন হয়, মেকানিক্যাল ভেনটিলেশন দিতে হবে তবে Arobivirus বা জাপানি এনসেফেলাইটিস-এর ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের হাতে খুব ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। তবে হোমিওপ্যাথিতে বেলেডোনা খুব ভালো কাজ করে।

সাবধানতা : পরিবেশ শুয়োর ও পরিযায়ী পাখি মুক্ত রাখতে হবে। মশা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে (মশা নিধন)। কোথাও জল জমতে দেওয়া যাবে না (মশার বংশবৃদ্ধি রোধ)। চৌবাচ্চার জল সাতদিনের মধ্যে পাল্টাতে হবে। অ্যাকোরিয়াম বা জলাশয়ে গাপ্পি মাছ ছাড়তে হবে। অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে শুতে হবে। পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে হবে। নর্দমা বা অপরিষ্কার জায়গায় ফিনাইল বা ব্লিচিং পাউডার দিতে হবে। শিশুদের অবশ্যই এম এম আর টিকা দিতে হবে। সংক্রমিত এলাকায় সকল সুস্থ মানুষের মধ্যে এনসেফেলাইটিস টিকা প্রদান। খোলা নর্দমায় মশা মারার তেল দেওয়া- সহ স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

সেবিকা সমিতির মাতৃসম্মেলন

গত ২৪ অক্টোবর দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর খণ্ডে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির বাছড়া শাখায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শুভদীপাবলি উপলক্ষে মাতৃসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দীপাবলির গুরুত্ব ও অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে এলোকেশী মায়ের তেজস্বিতার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে রাষ্ট্রজীবনে মায়েদের ভূমিকায় জীজাবাঈ, অহল্যাবাঈ, ঝাঁসিররানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবন প্রসঙ্গ টেনে বিভিন্ন দিকে আলোচনা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কুটুম্ব প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। এই কার্যক্রমে ৬৫টি পরিবার থেকে ১০১ জন মা ও বোনেরা উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘের কয়েকজন কার্যকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। সেবিকা সমিতির প্রার্থনার মাধ্যমে কার্যক্রম সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেবিকা সমিতির বোন বর্ষা প্রামাণিক।

সমুদ্রগড়ে হিন্দুত্ব আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা পুরুষ পরলোকে

জগদীশ চন্দ্র বসাক গত ১৩ অক্টোবর কালীপুজোর দিন সকালে অমৃতলোকে গমন করেন। মায়ের কৃপায় সময়টা ছিল অমৃতযোগ। ১৯৮০ সালে সমুদ্রগড়ে জগদীশবাবুর নেতৃত্বে স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ রায়ের উপস্থিতিতে প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বৈঠক হয় তাঁরই বাড়িতে। উদ্দেশ্য হিন্দু সংগঠন তথা সঙ্ঘের শাখা খোলা। সঙ্ঘকে জানার জন্য ৬ ঘণ্টা বাস জার্নি করে বাড়ি থেকে আসানসোল পূজনীয় বালাসাহেবজীর কার্যক্রমে গিয়েছেন একা। শুরু হলো শাখা। নিজের কলেজে পড়া ছেলেদের দিয়ে শুরু করলেন। শুরু হলো সমুদ্রগড়ে সঙ্ঘের কাজ। সমুদ্রগড়ে হিন্দুসংগঠন, সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অন্যান্য সমভাবাপন্ন সংগঠনের কাজ জগদীশবাবুর হাত দিয়ে শুরু হয়েছে। সমুদ্রগড়ে তাঁর এক বাক্যে পরিচিতি সৎ, তেজস্বী এবং কট্টর হিন্দু হিসেবে তাঁর নিজের পরিবার পূর্ণ সঙ্ঘপরিবার। বর্তমানে তাঁর এক পুত্র সঙ্ঘের মহকুমা কার্যকর্তা, আরেক পুত্র সঙ্ঘের বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ, বড় পুত্রও স্বয়ংসেবক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তিন পুত্র, চার কন্যা, পত্নী, নাতি-নাতনি-সহ অগণিত গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। তাঁর শবযাত্রায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

প্রণবানন্দ নগরে বিজয়া সম্মেলনী উদ্‌যাপন

গত ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় যাদবপুরের পালবাজার সংলগ্ন 'সংস্কৃতি চক্র' সভাগৃহে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রণবানন্দ নগরের স্বয়ংসেবকদের মিলিত প্রচেষ্টায় মনোজ্ঞ পরিবেশে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বে সংস্কার ভারতীর শিল্পীবৃন্দের কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান। সভাপতিত্ব করেন অল্ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ল' ইয়ার্স ফোরামের সহ-সভাপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট অমিত চক্রবর্তী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন— কলকাতা মহানগরের বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রশান্ত চৌধুরী, কলকাতা দক্ষিণ ভাগের সঙ্ঘচালক সীতেশ ভট্টাচার্য, কলকাতা দক্ষিণ ভাগের কার্যবাহ দীপনারায়ণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা দক্ষিণ বিভাগের কার্যবাহ সুব্রত রায়, কলকাতা দক্ষিণ ভাগের বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবানন্দ নগরের কার্যবাহ সমিত রায়, প্রণবানন্দ নগরের সম্পর্ক প্রমুখ স্বপন দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সভার একমাত্র বক্তা প্রশান্ত চৌধুরীর মনোজ্ঞ বক্তব্যে

উঠে আসে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরম পূজনীয় ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার কর্তৃক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ ও জাতি গঠনের জন্য চেতনাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা। যাদের মন্ত্র হবে স্বাদেশিকতা, স্বনির্ভরতা ও সাম্য, সঙ্গে হিন্দু সমাজকে জাগ্রত ও সংগঠিত করা। সঙ্ঘের বাস্তবিক মূল্যায়ন ক্ষেত্র হলো সমাজ। তাই সঙ্ঘ কর্মক্ষেত্র হিসাবে জাতি গঠন ও সমাজকেই বেছে নিয়েছে। সঙ্ঘের দ্বারা 'শাখা' ও 'সম্মেলনে' শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবকরা নিরন্তর সমাজ গঠনের কাজ করে চলেছে।

দিল্লীর লালকেল্লায় গীতার ৫১ ৫১ বর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লীর লালকেল্লার ময়দানে গীতার ৫১৫১ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গীতা প্রেরণা উৎসব হবে। এজন্য এবছরের ২ ডিসেম্বর থেকে ছ'দিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দি গ্লোব্যাল ইনসপিরেসন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট অর্গানাইজেশন অফ ভাগবত গীতা (জি আই ই ও গীতা) এর উদ্যোক্তা। এই উৎসবের শেষ দিন ৭ ডিসেম্বরে ৫১৫১ দম্পতি গীতা পাঠ করবেন। জি আই ই ও-র, পৃষ্ঠপোষক আর এস এসের কার্যকর্তা ইন্দ্রেশ কুমার জানিয়েছেন, ভারতের জাতীয়তার প্রতীক হিসেবে দিল্লীর লালকেল্লার ময়দানকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিবছর এই ময়দানেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে থাকেন। তিনি আরও জানান, গত বছর (২০১৩) গীতা জয়ন্তী যেখানে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে পালিত হয়েছিল। মহাভারতের যুদ্ধ ৫১৫১ বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল এবং ভগবান কৃষ্ণ এখানেই অর্জুনকে এই তিথিতে উপদেশ দিয়েছিলেন যা গীতা গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। অগ্রহায়ণ মাসের একাদশী তিথিতে এটা ঘটেছিল যা এবছর ২ ডিসেম্বরে পড়েছে। এই উৎসবে 'দি গীতা অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড' নামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গীতার ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হবে।

মালদায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বিজয়া ও দীপাবলি সম্মেলন

গত ২ নভেম্বর মালদা শহরের শ্যামাপ্রসাদ ভবনে মালদা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে বিজয়া ও দীপাবলি সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সাহিত্যিক আতসী বাগচী ও প্রাক্তন শিক্ষিকা সর্বাণী পালিত। সমবেত মা-বোনেদের সামনে সমাজ গঠনে মাতৃশক্তি জাগরণের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সেবিকা সমিতি জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ মানসী কর্মকার।

বজরঙ্গ দলের রক্তদান শিবির

গত ২ নভেম্বর সারা দেশে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে উত্তরবঙ্গে বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে ৮ স্থানে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গাতেই ৭৮ জন রক্তদান করেন। শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবির উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ-সহ বিভাগ সঙ্ঘচালক কে পি আগরওয়াল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী গৌতম সরকার। শ্রী সরকার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। রক্তদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং-য়ের সাংসদ এস এস আলুওয়ালিয়া। রক্তদান শিবির সঞ্চালন করেন নগর সভাপতি সুশীল রামপুরিয়া এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নগর সম্পাদক রাকেশজী।

হিন্দুস্থান সমাচারের আলোচনা সভায় রাজ্যপাল শ্রীত্রিপাঠি

''জনতার রাষ্ট্রীয় হিতের দিকে লক্ষ্য রাখলে সংবাদপত্রের মালিকানা ও সাংবাদিকের স্বাধীনতার মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর হবে। রাষ্ট্রহিতের প্রতি উভয় পক্ষেরই দায়বদ্ধতা চাই।'' গত ১ নভেম্বর কলকাতায় ওসওয়াল ভবন সভাগৃহে এক আলোচনা সভায় একথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক রঞ্জিত রায়। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার এই আলোচনা সভার উদ্যোক্তা। আলোচনার বিষয় 'মিডিয়া— মালিকানা ও স্বাধীনতা।'

অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর সর্বভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। আলোচ্য বিষয়টির বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রেস কাউন্সিল-এর প্রাক্তন সদস্য অসীম কুমার মিত্র ও ইন্ডিয়া হেড : আজ টিভি-র প্রবীণ সাংবাদিক পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ। কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর অডিও-ভিসুয়াল বার্তা সকলকে শোনান হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'নোয়াখালি দিবস ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ'—একটি জনচেতনা সভা

পশ্চিমবঙ্গ শুধু একটি স্থান মাত্র নয়, পশ্চিমবঙ্গ হলো বাঙালির মুক্ত অস্তিত্বের ভাবনা— পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে এই চেতনা জাগ্রত করতেই গত ১ নভেম্বর কলকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হয় 'নোয়াখালি দিবস এবং আজকের পশ্চিমবঙ্গ' নামে এক জনচেতনা অনুষ্ঠান। আগামী দিনে বাংলার আর কোনো প্রান্ত যাতে নতুন করে নোয়াখালিতে পরিণত না হয় তাই ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালি প্রসঙ্গ নিয়ে লেখক শান্তনু সিংহ, বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য এবং গবেষক মোহিত রায় ও ড. জিষ্ণু বসুর মতো বহু উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে অবস্থান করছে তা অত্যন্ত শোচনীয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং বাঙালি হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি ও তার শাসনভার এই সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে থাকা দরকার। তেমনি এর পাশাপাশি নবজাগরণে বাংলা মুক্ত ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার ধারাটি পুনর্জীবন ঘটিয়ে একটি সুস্থ সমাজ গঠিত করেছে তা অক্ষুণ্ণ রাখা চলে এই শর্ত দুটি বাস্তবে প্রয়োগের দাবি ওঠে এদিনের অনুষ্ঠানে। নোয়াখালি প্রসঙ্গে পেশায় আইনজীবী শান্তনু সিংহ বলেন, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন রাতে নোয়াখালিতে মুসলমানরা আক্রমণ হানে। হিন্দু মহিলাদের শাঁখা ভেঙে সিঁদুর তুলে জোর করে মুসলমান করা হয়। সঙ্গে পুড়িয়েও মারা হয় বহু মানুষকে। তিনি আরও বলেন, ১০ অক্টোবর রাতে নোয়াখালিতে এই ঘটনা ঘটে। ৬ নভেম্বর গান্ধীজী বিধ্বস্ত নোয়াখালি পরিদর্শনে আসেন। কিন্তু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে তিনি বিলাসবহুল দিন কাটিয়ে যান।

আজকের পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের হালহকিকত নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর কথায় বাংলাদেশ থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুপ্রবেশ চলছে। আজ যদি জনসচেতনতা না থাকে তাহলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষে এত বড় সীমান্ত সামলানো সম্ভব নয়।

শমীকবাবু বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বদলে আমরা পাকিস্তানে থাকতাম। তাই তাঁর অবদান কখনই ভোলার নয়। নোয়াখালি দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি ছিল স্লাইড শো-এর মাধ্যমে অবিভক্ত বঙ্গদেশে ভৌগোলিক অবস্থান, নোয়াখালির জনশিক্ষার ছবি ফুটে ওঠে। গবেষক জিষ্ণু বসু মাদ্রাসা সম্বন্ধে এন আই এ রিপোর্ট নিয়ে বলেন, ১০ হাজার খারিজি মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আর খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে যে মাদ্রাসাগুলির নাম উঠে এসেছে তার মধ্যে সবকটিই হলো খারিজি মাদ্রাসা। জিষ্ণুবাবু মাদ্রাসার পাঠক্রম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আহ্বায়ক প্রকাশ দাস এবং মোহিত রায়। অনুষ্ঠানে দর্শকদের সংখ্যাও ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

স্বপ্ন দেখাচ্ছে যুব হকি দল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়ী ভারতীয় যুব দলের উল্লাস।

ইনচিওন এশিয়াডে সিনিয়র ভারতীয় হকি দল সোনা জিতে যে স্বপ্নের জন্ম দিয়েছে, তাকেই যেন পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কুয়ালালামপুরের মাঠে নেমেছিল যুব ভারতীয় দল। সদ্য সমাপ্ত সুলতান অব জোহর কাপে (অনূর্ধ্ব ২১) যে দাপট ও মর্যাদা নিয়ে খেলে চাম্পিয়ন হয়েছে ভারত, তারপর একথা বললে অত্যুক্তি হবে না এই দলটিই পারবে দীর্ঘ তিন দশকের শূন্যতা, অন্ধকার কাটিয়ে অলিম্পিক মঞ্চে জয়পতাকা তুলে ধরতে। যদি এখন থেকেই এই দলটিকে ঠিকমতো পরিচর্যা করে, পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধে ও বিদেশে নিয়মিত বড় বড় শক্তিধর দলগুলির সঙ্গে খেলার সুযোগ করে দেওয়া যায় তবে দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটানো অসম্ভব নয়। বিশ্ববৃত্তে হকির যে কোনো বড় সাফল্য ভারতবর্ষের মাথা যতটা উঁচু করে দেয়, তার সঙ্গে অন্য কোনো খেলা বা শিল্পসংস্কৃতির বড় সাফল্যের তুলনা হয় না। কারণ হকিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান।

এশিয়াডে সর্দার সিংহের কুশলী নেতৃত্ব ও সামনে থেকে পারফর্ম করা আর অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা কোচ টেরিওয়ালশের গেম প্ল্যানিং ও স্ট্রাটেজি ভারতকে পোডিয়ামের সর্বোচ্চ ধাপে তুলে দিয়েছিল। ওই দলে অবশ্য বেশ কয়েকজন মাঝারিমানের খেলোয়াড়ও ছিলেন। কিন্তু তাদের সীমাবদ্ধতা সেভাবে চোখে পড়েনি। কারণ প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়া বাদে তেমন জবরদস্ত প্রতিপক্ষ কেউ ছিল না। আর পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়াও বিশ্বমানে এখন আর আহামরি দল নয়। অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, স্পেন, গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে যুব দলটিকে খেলতে হয়েছে গ্রেট বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো র‍্যাকিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা সব দলের সঙ্গে। আর কি দাপট নিয়ে খেলে ভারত এই সব দলকে হারিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াকে কোনো পর্যায়ের হকিতে ভারত শেষ করে ৬ গোল দিয়েছে। মালেশিয়ায় বসবাসরত ভারতীয়রা বিস্ফারিত নেত্রে প্রত্যক্ষ করলেন সারা মাঠ জুড়ে হরমনজিৎ, প্রবীণ কুমার, আরমান কুরেশিদের শিল্পের ফুল ফুটিয়ে নান্দনিক হকির ধ্রুপদী সুষমা আর অস্ট্রেলিয়ার অসহায় আত্মসমর্পণ।

পাকিস্তানকেও মাঠের প্রতিটি অঞ্চলে নাস্তানাবুদ করে গোলের মালা পরিয়ে ছেড়েছে ভারতীয়রা। ৬-০ গোলে জয় তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ১৯৮২-এর দিল্লী এশিয়াডের মধুর প্রতিশোধ নিতে পেরেছে তরুণ তুর্কী দলটি। গ্রেট বৃটেন গ্রুপ লীগে ভারতকে হারিয়ে ছিল। ফাইনালে অবশ্য অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি লড়াই দিয়েও ভারতীয়দের গতি রোধ করতে পারেনি তারা। আর ম্যাচের রাশ সব সময়ই হাতে ছিল ভারতের। এই দলটির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো রক্ষণ, মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগের মধ্যে চমৎকার সমন্বয়। মাঝমাঠে বল পজিশন কায়েম করে দ্রুত গতিতে আক্রমণে ওঠা আর বিপক্ষের 'ডি' এর মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ফিনিশ করা। ফিল্ড গোল ও সর্টকর্নার কাজে লাগানো। দু'ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে এইসব ছেলে। তিন-চাররকম ট্যাকটিক্স নিয়ে খেলতে পারে পরিস্থিতি অনুযায়ী। এটাও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হকি ইন্ডিয়ার উচিত এই দলের কয়েকজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় যেমন হরমনপ্রীত, কুরেশি, সিমরণজিৎ সিংহ, ইমরান খান, প্রবীণ কুমারদের এই মুহূর্তে সিনিয়র টিমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, যাতে তারা দ্রুত সর্বোচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক চাপ নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

২০১৬-র অলিম্পিয়াডে সরাসরি খেলবে ভারত। তার আগে বেশ কিছু বিদেশ সফর টেস্ট ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট খেলবে ভারত। যুব দলের এই পাঁচজনকে সিনিয়র টিমে অন্তর্ভুক্ত করলে একটা সুসংহত দল হয়ে উঠতে পারে ভারত এই দু-বছরের মধ্যে। ১৯৮০-র পর অলিম্পিকে সোনা অধরা। সোনা কেন ব্রোঞ্জ পদকও জোটেনি। এই খরা কাটিয়ে ওঠার জন্য হকি ইন্ডিয়া ও মাঠ কর্তাদের 'মাস্টার স্ট্রোক' দিতে হবে। সেই মাস্টার স্ট্রোকটি হলো দলগঠনে বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনা আমদানি করা এই সময়ে সর্বস্ব চ্যালেঞ্জ একবার নিয়েই দেখা যাক না ভারতীয় হকির নবজাগরণের স্বার্থে।

শব্দরূপ-৭২৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

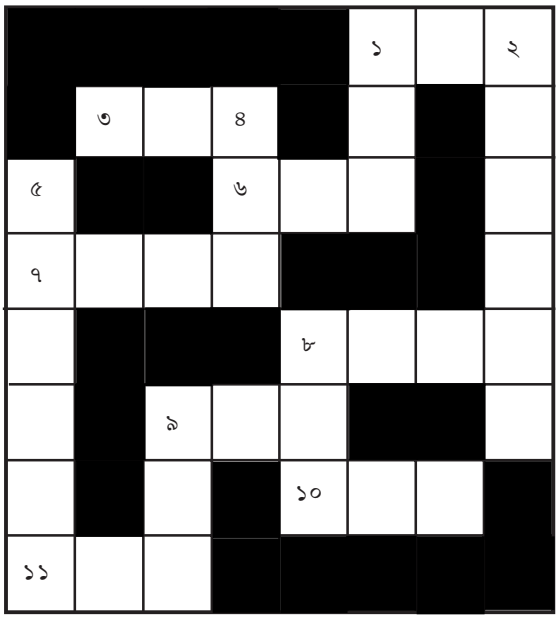

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. কড়ির উপরের কাঠা বা লোপ যাহার উপর ছাদ থাকে, **৩.** বৈদেহীর পিতা সবার পিতা, **৬.** হাতমোজা, **৭.** ব্যাসের পিতা, বিখ্যাত ঋষি, **৮.** প্রতাপ, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি, **৯.** স্বামীর বড় ভাই, **১০.** সন্ধ্যাবন্দনাদিতে জপ্য ত্রিপাদ মন্ত্র বিশেষ, **১১.** দর্শন, উপদেশ বা সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য প্রদেয় অর্থ (প্রণামী ফি ইত্যাদি)।

উপর-নীচ : ১. স্তব, স্তুতি, **২.** অপরের অনুমতি না লইয়া বর-কন্যার স্বমতে বিবাহ, **৪.** মর্যাদা, আদর, যত্ন, **৫.** জগতের সমস্তই কল্যাণপ্রসূ এই মতবাদ, **৮.** পীরের কবর, উলটে নিলেই কারাগার, **৯.** কোপনা নারী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

					পো	লি	ও
	সি	দ্ধা	ই		দ্দা		কা
ভূ			জা	ব	র		ল
ম	নো	হ	রা				ত
ধ্য				গো	রো	চ	না
সা		বা	র্তা	কু			মা
গ		ম		ল	লি	তা	
র	ত	ন					

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭২৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দাবৈরাগী ।। ৭

বালুরঘাটে বহুভাষী এক জঙ্গি ধৃত

সংবাদদাতা : বালুর ঘাট॥ হিন্দি ভাষা, ভারতীয় বাংলা ভাষা থেকে শুরু করে আরবি, উর্দু, বার্মিজ, ইংরাজি-সহ মোট

সাতটি ভাষায় পারদর্শী। সঙ্গে মিলেছে একাধিক সিম-সহ মোবাইল ফোন। প্রত্যেকটি ফোন আবার পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করা। পুলিশ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই পাসওয়ার্ডের লক ভাঙতে পারছে না। সম্প্রতি বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ধরনের এক যুবক পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই যুবককে আদালতের মাধ্যমে হেফাজতে নেওয়ার পরও তার নাম ঠিকানা জানতেই সংশয় তৈরি হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই যুবককে আদালতের মাধ্যমে হেফাজতে নেওয়ার পরও তার নাম ঠিকানা জানতেই হিমসিম অবস্থা। হেফাজতে নিয়ে পুলিশ তার কাছ থেকে সঠিক কোনো তথ্যই জানতে পারছে না। ওই যুবক কোনো প্রশিক্ষিত জঙ্গি কিনা বা জঙ্গি সংগঠনের কোনো সক্রিয় সদস্য কিনা তা জানতে চাইছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, ধরা পড়ার পর থেকে বহু চেষ্টার পরও ওই যুবকের ফোনের লক ভাঙতে পারেনি পুলিশ। অবশেষে ফোন থেকে মেমোরি বের করে কিছু তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক জানিয়েছে, তার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলাম। জিজ্ঞাসাবাদে তার বাড়ি কখনও সে উদ্‌বাস্তু হিসাবে দিল্লীর কথা বলেছে, তবে তার কাছ থেকে উদ্‌বাস্তুর কোনো নথি পাওয়া যায়নি। কখনও জানিয়েছে সে কলকাতার বাসিন্দা। কলকাতার কোনো একটি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছে। তবে পুলিশ মোবাইল ফোন থেকে জানতে পেরেছে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার বাসিন্দা সে। মাত্র ২০-২২ বছর বয়সী ওই যুবকের এই চরিত্র নিয়ে রীতিমতো ধন্দে পুলিশ। তবে এই পরিস্থিতিতে ওই যুবককে সিআইডি বা এনআইএ'র হাতে তুলে দেওয়া হবে কিনা তা এখনও ঠিক করতে পারেনি পুলিশ।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু তথ্যই জানা সম্ভব হতে পারে। সে কোনো জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত তা জানা সম্ভব হলেই ভারতে জঙ্গি সংগঠনের কোথায় কি ধরনের কার্যকলাপ হয় বা কোন মাদ্রাসায় কি ধরনের কার্যকলাপ হয় মাদ্রাসার তাও এই যুবকের মাধ্যমে জানা সম্ভব হতে পারে। প্রসঙ্গত, করিডর হিসাবে ব্যবহার করা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গত এক মাসে প্রায় দুইশ'রও বেশি বাংলাদেশি অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে বিএসএফ বা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। বিএসএফ প্রতি ক্ষেত্রেই হয় ধৃতদের বাংলাদেশে পুসব্যাক করেছে অথবা সন্দেহজনক অবস্থা দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে আরও জওয়ান নিয়োগ করা দরকার কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সাধারণ মানুষ থেকে অভিজ্ঞ মহল।

বাঁকুড়ায় গো-হত্যা রুখে দিল গ্রামবাসী

সংবাদদাতা।। ঈদের দিনে গো-কুরবানির উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার হিংজুড়ী গ্রামের কয়েকটি মুসলমান পরিবারের কর্তাব্যক্তি বিষ্ণুপুর থানায় অনুমতি নিতে যায়। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যাওয়াতে ৫ অক্টোবর ওই গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলি মিলিত হয়ে বিষ্ণুপুর থানায় এসে বিক্ষোভ দেখায়। এই বিক্ষোভের ফলে পুলিশ তাদের দেওয়া অনুমতি ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। হিংজুড়ী গ্রামের বাজার মোড়ে কুরবানি করার উদ্দেশ্য থাকায় পরের দিন অর্থাৎ ৬ অক্টোবর হিন্দু সমাজের অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়। উত্তেজনা থাকায় পরক্ষণে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে পৌঁছয় গ্রামে। হিন্দুপাড়ায় গোহত্যা না করে সাধারণভাবে ঈদ পালন করেই খুশি থাকতে হয় মুসলমানদের।

ইংরেজবাজারে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ গত ২৯ অক্টোবর বুধবার মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার বাঁধাপুকুর কমলাবাড়ি থেকে জঙ্গি সন্দেহে এক ব্যক্তিকে স্থানীয় মানুষ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এইভাবে এক ব্যক্তি জঙ্গি হিসাবে ধরা পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সামিল শেখ (৩২) নামে এক যুবক দুপুর থেকে বাঁধাপুকুর মোড়ে ঘোরাফেরা করছিল। শম্ভু ঘোষ ও কিছু যুবক তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার ব্যাগ তল্লাশি করলে ব্যাগের ভিতর থেকে ভারতের মানচিত্র, ৭-৮টি বড় বোম পটকা, দুটি মোবাইল, কিছু সিমকার্ড ও :কাগজপত্র পাওয়া যায়। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলে শেখ সালিম জানায় যে তার বাড়ি বর্ধমানের পানাগড়ে। এতেই সবার সন্দেহ হয় এবং সন্ধেবেলাতে তাকে ইংরেজ বাজার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও এর তদন্ত এন আই এ-কে দিয়ে না করালে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার হবে না বলে ওয়াকিবহালের অভিমত।

তৃণমূল সরকার এই ঘটনাকেও সামান্য ঘটনা বলে চেপে যাবে বলে স্থানীয় মানুষ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
10 November - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা